গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৮ বর্ষ ২২ সংখ্যা ৮ - ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

জনগণ কর লেভি সেস দিচ্ছে
হাজার হাজার কোটি টাকা যাচ্ছে কোথায়?

সরকারকে ট্যাক্স-সেস-লেভি হিসাবে টাকা দিয়েই চলেছেন দেশের মানুষ। এই টাকা দিয়ে জনগণের কিছু বুনিয়াদি চাহিদা সরকারের পূরণ করার কথা। শিক্ষা বিস্তার, রাস্তা সম্প্রসারণ, গবেষণা, শ্রমিক কল্যাণ ইত্যাদি নানা জনকল্যাণমূলক খাতে সেই টাকা ব্যয় করার কথা। সরকার কি এসব খাতে তা ব্যয় করছে? হিসাব বলছে বহু ক্ষেত্রে সরকার তা করেনি। তা হলে কোথায় যাচ্ছে সেই টাকা? প্রশ্ন তুলেছে সরকারেরই হিসাব পরীক্ষক সংস্থা কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সি এ জি)।

২০১৪-'১৫ সালে সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়ে ২২ ডিসেম্বর পার্লামেন্টে সি এ জি যে রিপোর্ট দিয়েছে তাতে বলা হয়েছে, ট্যাক্স-সেস-লেভির মাধ্যমে আদায়ীকৃত টাকার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হয় খরচ না করে অলস ফেলে রাখা হয়েছে অথবা অন্য খাতে খরচ করা হয়েছে। সি এ জি বলেছে, ছয়টি খাতে গত দশ বছরে অন্তত তিন লক্ষ কোটি টাকা আদায় হয়েছে, অথচ তা সংশ্লিষ্ট খাতে খরচ করা হয়নি। সি এ জি-র হিসাব অনুযায়ী, ২০০২-'০৩ আর্থিক বছর থেকে ২০১৪-'১৫ পর্যন্ত টেলিকম বিভাগ ৬৬, ১১৭ কোটি টাকা আদায় করেছে ইউনিভার্সাল সার্ভিস অবলিগেশন বাবদ। এর মধ্যে খরচ করা হয়েছে মাত্র ২৬,৯৮৩ কোটি টাকা। বাকি ৩৯,১৩৪ কোটি টাকা এই খাতে খরচ না করে হয় অলস ফেলে রাখা হয়েছে অথবা অন্য খাতে খরচ করা হয়েছে। এই টাকা দিয়ে গ্রামীণ জনগণের কাছে টেলিফোন এবং ব্রডব্যান্ড সার্ভিস পৌঁছে দেওয়ার কথা। বেসরকারি কোম্পানিগুলি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ব্রডব্যান্ড সার্ভিস নিয়ে পৌঁছে গেলেও সরকারি টেলিকম সংস্থা পারেনি। অথচ অনায়াসেই এ কাজ তারা করতে পারত। বহুক্ষেত্রেই টাকার অভাবের যে অজুহাত তোলা হয়, এ ক্ষেত্রে অন্তত তার তো কোনও সুযোগ ছিল না। সরকারের এই ভূমিকার ফলেই রাষ্ট্রায়ত্ত বি এস এন এল গ্রাহকদের বাধ্য করা হচ্ছে বেসরকারি সংস্থাগুলির গ্রাহক হতে। স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়, বেসরকারি কোম্পানি এবং সরকারি আমলা-অফিসার-মন্ত্রী চক্রের যোগসাজশ দেখছেন অনেকেই।

একইভাবে সরকার ১৯৯৬-'৯৭ আর্থিক বছর থেকে ২০১৩-'১৪ আর্থিক বছর পর্যন্ত গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য সেস বাবদ ৪,৯০০ কোটি টাকা আদায় করেছে। এর মধ্যে কাজে লাগানো হয়েছে মাত্র ৫৪২ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৯০ শতাংশ টাকা খরচই করা হয়নি।

দুয়ের পাতায় দেখুন

হীন মতলবেই আবার রামমন্দির ইস্যু খুঁচিয়ে তুলছে বিজেপি

এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৩১ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেছেন,

উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক সংঘ পরিবারেরই এক শরিক বিশ্ব হিন্দু পরিষদ যেভাবে আবার অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ ইস্যুকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলতে নেমে পড়েছে, তার একমাত্র উদ্দেশ্য দেশের মধ্যে আবার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন জ্বালানো, যাকে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি।

সম্প্রীতির সাথে বসবাসকারী শান্তিপ্রিয় দেশবাসী দেখেছিলেন, কীভাবে সংঘ পরিবার রাম-এর মতো পুরাকাহিনির একটি চরিত্রের জন্মস্থানের প্রশ্ন তুলে বাস্তবে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক সৌধ বাবরি মসজিদকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে ওই স্থানেই রামমন্দির নির্মাণের জিগির তুলেছিল। এর পরিণামে সমগ্র দেশে পরপর যে রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে যায় এবং হিন্দু ও মুসলমান ভারতের দুই প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে যে গুরুতর বিভেদের প্রাচীর তৈরি হয়ে যায়, তার মূল হোতাই ছিল সংঘ পরিবার। এ কথা তখন গোপন থাকেনি যে সাম্প্রদায়িকতার এই

দুয়ের পাতায় দেখুন

মিলিটারি কামরায় নাবালিকা ধর্ষণ
রাজভবনে তুমুল বিক্ষোভ

রাজভবনের সামনে বিক্ষোভরত ছাত্র-যুব-মহিলাদের টেনেহিঁচড়ে গ্রেপ্তার করছে পুলিশ

২৮ ডিসেম্বর অমৃতসর এক্সপ্রেস ট্রেনে সেনা জওয়ানদের দ্বারা নাবালিকা ধর্ষণের প্রতিবাদে ২৯ ডিসেম্বর কলকাতায় রাজভবনের নর্থ গেটের সামনে তুমুল বিক্ষোভ দেখায় অল ইন্ডিয়া ডি এস ও, অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও এবং অল ইন্ডিয়া এম এস এস। ২৫ জন বিক্ষোভকারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে, ৭ জন গুরুতর আহত হয়। অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড অংশুমান রায় বলেন, 'জনগণের ট্যাক্সের টাকায় পালিত তথাকথিত রক্ষক সেনা জওয়ানদের এই ন্যক্কারজনক ঘটনায় দেশবাসী স্তম্ভিত। ২৯ ডিসেম্বর দিল্লির প্যারামেডিক্যাল ছাত্রী দামিনীর স্মরণ দিবসেও নির্যাতিত নারীর আর্তনাদ শুনতে হয়। এ সভ্যতার লজ্জা। আমরা দাবি করছি রেলে নারী নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ রেল মন্ত্রী সহ ঘটনায় জড়িত সেনা জওয়ানদের অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

নন্দীগ্রামের দোষী পুলিশ কর্তারা তৃণমূল শাসনে পুরস্কৃত হচ্ছেন

ক'দিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী নন্দীগ্রামে গিয়ে নন্দীগ্রামবাসীদের উদ্দেশ্য বেশ কিছু ভালো ভালো কথা বলে এলেন। বললেন, তিনি নন্দীগ্রামের মানুষকে ভুলবেন না। বললেন, 'ভুলতে পারি নিজের নাম, ভুলব নাকো নন্দীগ্রাম।' এমন মিষ্টি মিষ্টি মন ভোলানো কথা তিনি এর আগেও বলেছেন। তারও আগে যখন তিনি মুখ্যমন্ত্রী হননি, যখন বিরোধী নেত্রী, তখন বলেছিলেন, রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় এলে নন্দীগ্রামে গুলিচালনার তদন্ত হবে, দোষী পুলিশ ও সিপিএম নেতাদের শাস্তি হবে, আন্দোলনকারী কৃষকদের উপর থেকে মিথ্যা মামলা তুলে নেওয়া হবে।

নন্দীগ্রামের মানুষের দীর্ঘ সংগ্রামে রক্ত এবং আত্মদানের মধ্য দিয়ে রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন তিনি। সেই শাসনেরও প্রায় পাঁচ বছর হতে চলল। কিন্তু নন্দীগ্রামের মানুষকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি তিনি। দোষী পুলিশ অফিসারদের শাস্তির কোনও ব্যবস্থা করেননি। কোনও অত্যাচারী সিপিএম নেতার শাস্তি হয়নি। শাস্তি দেওয়া দূরের কথা ঘাতক পুলিশ অফিসারদের, আমলাদের একের পর এক পদোন্নতির ব্যবস্থা করেছেন।

সংবাদে প্রকাশ, ২০০৭ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি আই জি (আইন শৃঙ্খলা)-র ঘরে ১৪ মার্চের অপারেশন শুরুর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সিপিএম আমলের সেই আই জি রাজ কানোজিয়া তৃণমূল আমলে রাজ্য পুলিশের ডিজি (কোস্টাল) পদে উন্নীত হন। তাঁকে দার্জিলিং-এর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে। অপারেশনের মূল দায়িত্বে থাকা আইজি (পশ্চিমাঞ্চল) অরুণ গুপ্তা পদোন্নতি পেয়ে এ ডি জি (ট্র্যাফিক) থেকে এ ডি জি (সদর)-এর দায়িত্ব পান। তেখালি ব্রিজে ক্যাম্প করে থাকা ডি আই জি (মেদিনীপুর রেঞ্জ) এন রমেশবাবু তৃণমূল শাসনে মোট চারটি পদোন্নতি পেয়ে প্রথমে রেলের আই জি হন এবং সর্বশেষ তাঁকে উত্তরবঙ্গের আই জি পদ দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী।

অধিকারী পাড়ার গুলিচালনার ঘটনায় যে দু'জন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল সেই দুই আই পি এস কর্তা সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেবাশিস বড়াল তৃণমূল সরকারের আমলে একাধিক প্রোমোশন পেয়েছেন। সত্যজিৎবাবু

ছয়ের পাতায় দেখুন

পশ্চিম মেদিনীপুরে বিভিন্ন অঞ্চলে

পরিচারিকা সম্মেলন

সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচারিকা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

পরিচারিকাদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি, ন্যূনতম মজুরি, সাপ্তাহিক ছুটি, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পে আনা, মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রভৃতির দাবিতে ১৯ ডিসেম্বর খড়্গপুর ১নং আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সাহানা খাতুনকে সভানেত্রী এবং গঙ্গা পালই ও সেলু দোলইকে যুগ্ম সম্পাদিকা করে আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়। ২০ ডিসেম্বর মেদিনীপুর শহরে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক সম্মেলনে পুষ্প দাস সভানেত্রী এবং রুনু পাতর ও কবিতা দাস যুগ্ম সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। ২১ ডিসেম্বর বেলদা আঞ্চলিক সম্মেলনে কবিতা জানা সভানেত্রী এবং গোপা কাপড়ি ও মৌসুমী সাউ যুগ্ম সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। ২ জানুয়ারি সবং-এর তেমাথানী আঞ্চলিক সম্মেলন থেকে চন্দনা ধাড়া সভানেত্রী এবং সীতা বেরা ও দুলালী দাস যুগ্ম সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। ৩ জানুয়ারি খড়্গপুর ২নং আঞ্চলিক সম্মেলনে সভানেত্রী মৌসুমী বেরা, সহ সভানেত্রী শেফালী মিদ্যা এবং যুগ্ম সম্পাদিকা অলকা মিদ্যা ও শ্যামলী কালিন্দী নির্বাচিত হন।

আঞ্চলিক সম্মেলনগুলিতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী লিলি কুণ্ডু, সম্পাদিকা পার্বতী পাল, জেলা সম্পাদিকা জয়শ্রী চক্রবর্তী প্রমুখ। তাঁরা সমিতির গুরুত্ব এবং দাবি আদায়ে শক্তিশালী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

(ছবি ঃ চারের পাতায়)।

হীন মতলবেই আবার রামমন্দির

একের পাতার পর

আগুন জ্বালাবার পিছনে একমাত্র লক্ষ্য ছিল দেশের মানুষের মধ্যে কৃত্রিমভাবে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ঘটিয়ে বিজেপি-র সরকারে যাওয়ার পথ সুগম করা।

বর্তমানে যখন দেশের মানুষের সামনে বিজেপির মুখোশ খুলে গেছে এবং তাদের প্রাক-নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলি ফাঁকা বুলি বলে প্রমাণ হয়েছে, তখন জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘোরাবার জন্য আর এস এস-বিজেপি অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে রামমন্দির ইস্যু খুঁচিয়ে তুলে হিন্দু ভাবাবেগ জাগাতে চাইছে এ কথা জেনেই যে, এর পরিণাম ভয়ঙ্কর।

সাম্প্রদায়িক বিভাজন বৃদ্ধি পেলে আর এস এস-বিজেপির অভিভাবক বুর্জোয়াদের স্বার্থও রক্ষা পায়, কারণ তা বুর্জোয়া বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে ওঠার পথে বাধা সৃষ্টি করে।

উত্তরপ্রদেশের সরকারের কাছে আমরা দাবি জানাচ্ছি, রামমন্দির ইস্যু খুঁচিয়ে তুলে সাম্প্রদায়িক আগুন জ্বালাবার সুযোগকে রদ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি জনগণের প্রতি আমাদের আবেদন, সাম্প্রদায়িক শক্তির জঘন্য অভিসন্ধির ফাঁদে না পড়ে নিজেদের ঐক্য রক্ষায় তাঁরা যেন দৃঢ় থাকেন।

টাকা যাচ্ছে কোথায়?

একের পাতার পর

প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ২০০৪ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ১,৫৪,৮১৮ কোটি টাকা শিক্ষা সেস বাবদ আদায় হয়েছে। এখানে ১৩,২৯৮ কোটি টাকা খরচ করা হয়নি। মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সেস ধার্য হয়েছিল ২০০৭ সালে। ২০১৫ সাল পর্যন্ত এই খাতে আদায় হয়েছে ৬৪ হাজার কোটি টাকা। এই টাকা কোথায় কত ব্যয় হয়েছে তা নিয়ে কোনও স্বচ্ছ হিসাব নেই। কেন নেই? সম্ভবত অপচয় এবং দুর্নীতির চোরাপথে তা গায়েব হয়ে গেছে।

এই সময়ে সরকারে কারা ছিল? প্রথম দুই বছর অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রীত্বে বিজেপি এবং শেষ এক বছর নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রীত্বে সেই বিজেপি। মাঝের টানা দশ বছর ক্ষমতায় মনমোহন সিংহের প্রধানমন্ত্রীত্বে কংগ্রেস। ফলে এই ট্যাক্স জালিয়াতির দায় এই দুই দলের উপরই বর্তায়।

কংগ্রেস এবং বিজেপি ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণির অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য দুটি সর্বভারতীয় দল। বুর্জোয়া শ্রেণি কেন্দ্রে এই দুই দলকে পালাক্রমে ক্ষমতায় আনে। বুর্জোয়াদের সেবা করে একদল জনসমর্থন হারালে তখন অন্য দলকে নিয়ে আসে। জনগণের দেওয়া টাকা কেন জনকল্যাণে খরচ করা হয়নি, কেন অলস করে ফেলে রেখে জনদুর্ভোগ বাড়ানো হয়েছে, তার জবাব এই দুই দলকেই দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, সি এ জি-র বক্তব্য অনুযায়ী, টাকা যদি অন্যখাতে সরানো হয়ে থাকে তা হলে কোন কোন খাতে সরানো হয়েছে তা জনগণকে জানাতে হবে। জনগণ জানতে চায় এই টাকা দিয়ে মন্দার অজুহাতে পুঁজিপতিদের ভরতুকি দেওয়া হয়নি তো? জনগণের আরও প্রশ্ন, গবেষণার জন্য দেওয়া টাকা ফেলে রেখে কেন এক অংশের গবেষকদের ভাতা বন্ধ করে দেওয়ার ফরমান জারি করেছে বর্তমান বিজেপি সরকার? প্রধানমন্ত্রী অবশ্য দাবি করতেই পারেন, সব কথাই যখন অতীতের মুনি-ঋষিরা বলে গিয়েছেন তখন আর নতুন গবেষণার দরকার কী!

দেশের মানুষ সরকারকে সাধারণ ট্যাক্স দিয়েই থাকেন। এর বাইরে বিশেষ কাজ করার নামে জনসাধারণের কাছ থেকে বিশেষ ধরনের লেভি, সেস প্রভৃতি হামেশাই চাপিয়ে যাচ্ছে সরকার। সবই করা হচ্ছে উন্নয়নের নামে। কার পকেট ভরিয়ে কার উন্নয়ন করা হচ্ছে, তা দেশের মানুষ দেখতেই পাচ্ছে।

তথ্যসূত্র ঃ টাইমস অব ইন্ডিয়া ৩১.১২.২০১৫, দি হিন্দু ২৪.১২.২০১৫

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-র দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রাজারাম রায়মণ্ডল দীর্ঘ রোগভোগের পর ২৭ ডিসেম্বর ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মাত্র ৬৬ বছর বয়সে এই মৃত্যু অনিবার্য ছিল না। বামফ্রন্ট আমলে মিথ্যা মামলায় দীর্ঘ কারাজীবন তাঁর জীবনীশক্তিকে ধ্বংস করে দেয়। কিডনির গুরুতর রোগে ভুগছিলেন, চলছিল নিয়মিত ডায়ালিসিস। পি জি হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন নানা রোগের উপসর্গ দেখা দেওয়ায় গুরুতর অবস্থায় পুনরায় তাঁকে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে স্থানান্তর করা হয়। রক্তে সেপ্টিসেমিয়া দেখা দেয়। বহু চেষ্টা করেও তাঁকে বাঁচাতে চিকিৎসকরা ব্যর্থ হন। খবর পাওয়ার সাথে সাথেই রাজ্য ও জেলা নেতৃবৃন্দ হাসপাতালে যান। দলের জেলা অফিসে পতাকা অর্ধনমিত করা হয়।

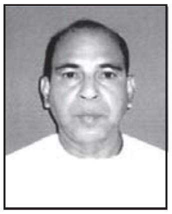

কমরেড মণ্ডল ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট জননেতা। ১৯৭০ সালে তিনি ক্যানিং কলেজে সাধারণ ছাত্রদের নিয়ে কমিটি গঠন করে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে ছাত্র সংসদের সম্পাদক নির্বাচিত হন। এরপরই তিনি এস ইউ সি আই (সি) দলের সংস্পর্শে আসেন, জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলানের সাথে আলোচনায় দলের বিপ্লবী রাজনীতি, বিশেষত কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। দলের কর্মী হিসাবে তাঁর ভূমিকা শুরু হয়। আর্থিকভাবে সচ্ছল পরিবারের সন্তান হলেও এলাকার চাষি-মজুর-গরিব মানুষদের সাথে তাঁর অকৃত্রিম দরদি সম্পর্কের ফলে তিনি তাঁদের স্বাভাবিক নেতায় পরিণত হন। বেনাম জমি উদ্ধার ও চাষিদের মধ্যে বিলি করা, মজুরি বৃদ্ধি, জোতদারদের নানা অনাচার প্রতিরোধ ইত্যাদি আন্দোলনে বলিষ্ঠ ও যোগ্য ভূমিকা নেন। যথারীতি তিনি কায়েমি স্বার্থবাদীদের চক্ষুশূল হয়ে ওঠেন। '৮০-র দশকে ২৪ এপ্রিল পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবসে কলকাতার সমাবেশ থেকে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে লরিতে করে ফেরার পথে সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁকে হত্যার জন্য বোমা ছুঁড়লে ঘটনাচক্রে তিনি বেঁচে গেলেও দলের দুই কর্মী কমরেডস রাধাকান্ত প্রামাণিক ও বিদ্যাধর হালদার ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। দীর্ঘদিন এহেন বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতির মধ্যেও তাঁর দৃপ্ত ও অদম্য উদ্যোগ অটুট ছিল। বিপ্লবী তত্ত্বচর্চায় গভীর আগ্রহ ছিল তাঁর।

তিনি বেলে-দুর্গানগর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে স্কুলের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে গেছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার নানা ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করায় তাঁর অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি অঞ্চল প্রধান নির্বাচিত হয়ে দুর্নীতিমুক্ত পঞ্চায়েত পরিচালনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাঁর সংস্পর্শে এসে অনেকেই দলের সাথে যুক্ত হয়েছেন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় ও ক্রিয়াকলাপে তাঁর ভূমিকা ছিল। প্রাথমিকে ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ-ফেল প্রথা পুনঃপ্রবর্তনের আন্দোলনে ধারাবাহিক ভূমিকা পালন করার সাথে সাথে, মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে আন্দোলনও গড়ে তোলেন। অন্যান্য মিথ্যা মামলার মতোই চৌভাঙির একটি ঘটনায় তিনি মিথ্যা অভিযুক্ত হয়ে অন্যান্য নেতা-কর্মী সহ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন। দলমতনির্বিশেষে সকলেই বিশ্বাস করতেন রাজারামবাবু সম্পূর্ণ নির্দোষ। তিনি কারাজীবনেই গুরুতর রোগে আক্রান্ত হন। প্যারোলে থাকার সময় হৃদরোগ ও মূত্রাশয়ের রোগের জন্য তাঁর চিকিৎসা হয়। তখন থেকে তিনি আর সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারেননি। কারান্তরালে ১৪ বছর কাটানোর পর হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়ে বাইরে আসেন। স্থানীয় মানুষের পারিবারিক সমস্যা, কলহ-বিবাদ নিরসনে, সামাজিক সমস্যার সমাধানে বিচার-সালিশির জন্য কেউ এলে তিনি তাঁদের জন্য অক্লান্ত ভূমিকা নিতেন। তিনি জনপ্রিয় ছিলেন তাঁর উন্নত আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও রুচিবোধ, শোষিত শ্রেণির প্রতি ভালবাসা, সাহসে বলীয়ান পদক্ষেপ, অদম্য অগ্রণী ভূমিকা ইত্যাদি গুণাবলির কারণে। দলের ও নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য ছিল উল্লেখযোগ্য। সরল ও উদার মনের এই মানুষটির দরজা দলমতনির্বিশেষে সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এই জনদরদি নেতার মৃত্যুসংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক হাসপাতালে রাজ্য নেতৃবৃন্দ, কলকাতা জেলার বিভিন্ন ইউনিট, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মাল্যদানের পর দলের কেন্দ্রীয় অফিসে তাঁর মরদেহ নিয়ে আসা হয়। সেখানে রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস তপন রায়চৌধুরী, স্বপন ঘোষ, মানব বেরা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা কমিটির পক্ষে রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড নন্দ কুণ্ডু, কমরেড অজয় সাহা, এ আই এম এস এসের রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী, জয়নগর পুরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান কমরেড প্রবীর বৈদ্য, বিভিন্ন গণসংগঠনের রাজ্য ও জেলা কমিটি, কেন্দ্রীয় অফিস, গণদাবী প্রেস ইত্যাদির পক্ষে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানোর পর মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে ও আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের পর দলের জেলা কমিটির তত্ত্বাবধানে তাঁর মরদেহ জেলা অফিসে নেওয়া হয়। কয়েক শত কমরেডের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেডস প্রবোধ পুরকাইত, গোপাল বসু, প্রফুল্ল মণ্ডল, জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস পাঁচু নস্কর, গোবিন্দ হালদার, জয়কৃষ্ণ হালদার, রূপম চৌধুরী সহ সকল সদস্যরা, বিধায়ক কমরেড তরুণ নস্কর, বিভিন্ন গণসংগঠন ও শ্রমিক ইউনিয়ন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। তারপর কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে রচিত সঙ্গীত ও আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের পর কমরেডেরা তাঁর মরদেহ নিজ বাসস্থান বেলে-দুর্গানগর হয়ে শ্মশানের পথে নিয়ে যান। যাওয়ার পথে মোড়ে মোড়ে গুণমুগ্ধ মানুষ সমবেত হয়ে শ্রদ্ধা জানান। প্রতিটি মোড়েই শত শত মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নিমপীঠ, তুলসীঘাটা, কানকাটা মোড়, নতুন হাট, প্রিয়র মোড়, পদুয়া, মণিপুর বাঁশতলা, গোঁড়ের হাট, দক্ষিণ বারাসাত, পদ্মের হাট প্রভৃতি। বেলে-দুর্গানগর স্কুল মাঠে সহস্রাধিক মানুষ চোখের জল নিয়ে সমবেত হয়েছিলেন। সেখানে তাঁর দুই দাদা কমরেড সুনীল রায়মণ্ডল ও মোহন রায়মণ্ডল সহ অগণিত কর্মী-সমর্থকরা পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। ৯ জানুয়ারি তাঁর স্মরণসভায় স্মৃতিচারণ করে শ্রদ্ধা জানাবেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু।

কমরেড রাজারাম রায়মণ্ডল লাল সেলাম

ঘাতক আইসিস-এর বাড়বাড়ন্ত ন্যাটোর মদতেই

প্যারিসে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর গোটা পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া যেন হঠাৎ আইসিস বিরোধী কর্মকাণ্ডে তেড়ে ফুঁড়ে নামার আয়োজন করল। অন্তত তাদের ঘোষিত অবস্থান তাই। মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ন্যাটো গোষ্ঠীভুক্ত ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি, এমনকী খোদ আমেরিকা পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিন হুঙ্কার দিচ্ছে যে তারা আইসিস-এর নানা ঘাঁটির উপর শুধু বিমান থেকে বোমা বর্ষণেই আটকে থাকবে না, প্রয়োজনে স্থলবাহিনী নামিয়ে সরাসরি আক্রমণে যাবে। কিন্তু যতটুকু বিমান হানার খবর এখনও পর্যন্ত দুনিয়া দেখেছে, তাতে একটা জিনিস স্পষ্ট, ন্যাটো বাহিনীর বোমা আর যাই হোক আইসিস-এর গায়ে আঁচড়টুকুও দিতে পারেনি। ন্যাটো বাহিনীর আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু যে আইসিস নয়, বরং সিরিয়াতে বাসার আল আসাদ সরকারের উচ্ছেদ— এ নিয়ে এখন আর কোনও সন্দেহ নেই। সেই কারণেই আইসিস-এর প্রধান আর্থিক উৎস তেলের ব্যবসার উপর নিয়ন্ত্রণ আনার জন্য ন্যাটো বাহিনীর কোনও মাথাব্যথা নেই। ব্রিটেনের পার্লামেন্টে এমনকী এ আলোচনাও হয়েছে যে, আইসিস-এর তেল ট্যাঙ্কারের চালকদের সাধারণ নাগরিক হিসাবে গণ্য করতে হবে, ফলে তাদের উপর বোমাবর্ষণ করা উচিত নয়। তথ্য বলছে, আইসিস বিশাল এলাকা জুড়ে তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে, অসংখ্য যুবককে তাদের বাহিনীতে সামিল করছে, তাদের হাতে আধুনিকতম মারণাস্ত্র তুলে দিচ্ছে, তার জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল অর্থের জোগান তারা অনায়াসেই পেয়ে চলেছে। এক একজন তথাকথিত জেহাদি সৈনিককে আইসিস ৪০০ থেকে ২০০০ ডলার পর্যন্ত মাসিক বেতন দেয়। বহু দরিদ্র দেশের বেকার যুবকদের এই অর্থ দিয়েই তারা আকর্ষণ করছে, দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে তাদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দিচ্ছে। এই বিপুল অর্থের উৎস কী?

তাদের আয়ের প্রধান উৎস হল দখল করা তেলের খনি থেকে তেল বিক্রি। ফিনান্সিয়াল টাইমস পত্রিকার অনুসন্ধান থেকে জানা যায় দিনে প্রায় সাড়ে ১০ লক্ষ ডলার মুনাফা করে আইসিস শুধু তেল বেচে। এই তেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা মার্কিন মিত্র ইজরায়েল। গত বছর জুলাই মাসে নিউজ উইক পত্রিকা এক প্রাক্তন আইসিস সামরিক যোগাযোগ বিশেষজ্ঞকে উদ্ধৃত করে লিখেছিল আইসিস-এর তেলবাহী ট্রাক অবাধে ন্যাটোর সদস্য দেশ তুরস্কের সীমানা পেরিয়ে যায়। তুরস্কের অভ্যন্তরেই সেই তেল শোধনের ব্যবস্থা আছে। অশোধিত তেলের বড় অংশ তুরস্ক থেকে ইরাক হয়ে চলে যায় ইজরায়েলে। সেখানকার নানা বন্দর দিয়ে তেল বাইরে যায়। রয়টারের এক সাংবাদিক ২০১৪ সালের জুন মাসে জানান আইসিস-এর দখল করা তৈল ক্ষেত্র এবং কুর্দিস তৈল ক্ষেত্রগুলি থেকে বেআইনি পাইপলাইন তৈরি করে ইজরায়েলের আশকেলন বন্দরের মাধ্যমে জাহাজে তেল বোঝাই করা হচ্ছে এবং পাচার হচ্ছে (বিজনেস ইনসাইডার ডট কম)। ন্যাটো বাহিনী মহা হুঙ্কারে আইসিস-এর উপর যে সব বিমান থেকে বোমা ফেলছে তারা কিন্তু আইসিস-এর তৈল ক্ষেত্র বা তেল ট্যাঙ্কার দেখতেই পাচ্ছে না। তাদের বোমা পড়ছে গিয়ে আসাদ সরকারের সেনা এবং তাদের সমর্থক বাহিনীর উপর।

মার্কিন সংবাদপত্র ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে ২০১৩-১৪ সালে সৌদি আরব, কাতার কুয়েত, আরব আমিরশাহির কিছু ধনকুবের আইসিসকে প্রায় ৪ কোটি মার্কিন ডলার অনুদান দিয়েছে। ২০১5 সালে সেই অনুদান আরও বেড়েছে। ২০০৮-০৯ সালে আইসিস যখন কেবলমাত্র ইরাক ভিত্তিক কাজ করত তখন তাদের আয় ছিল মাসে ১০ লক্ষ ডলারের কম, সিরিয়াতে তাদের প্রবেশের পর ২০১৪ সালে দেখা যাচ্ছে তা বেড়ে দিনে ৩০ লক্ষ ডলারের বেশি দাঁড়িয়েছে। এই আয় দিন দিন বাড়ছে। কারণ মার্কিন মিত্র, তেল সমৃদ্ধ আরব দেশগুলি এবং ইজরায়েল ও ন্যাটোর অন্যতম সদস্য তুরস্ক সরাসরি ঘোষণা করেছে আইসিস-এর থেকেও তাদের বড় শত্রু সিরিয়ার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বাসার আল আসাদ-এর সরকার। সানডে টাইমসের মতো ব্রিটিশ ও মার্কিন সংবাদমাধ্যমই ২০১১ সাল থেকে একাধিকবার লিখেছে, সিরিয়ার বিদ্রোহীদের মদত দিতে একযোগে কাজ করে চলেছে সিআইএ, কাতারের গুপ্তচর সংস্থা প্রভৃতি সংগঠন। কাতার একসময় ব্যাঙ্ক থেকে সরাসরি আইসিসকে অর্থ দিয়েছে। র‍্যান্ড করপোরেশন নামক সমীক্ষা সংস্থা সুনির্দিষ্ট করে দেখিয়েছে কীভাবে ইরাক এবং সিরিয়ার আশেপাশের প্রতিবেশি দেশগুলি আইসিসকে অর্থ জুগিয়ে গেছে। তুরস্কের 'টার্কিশ স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট' জানিয়েছে সে দেশের সরকার শুধু ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই আইসিসকে ১০ লক্ষ ডলারের অস্ত্র সাহায্য দিয়েছিল। তার পরেও এই সাহায্য তারা বহুবার দিয়েছে।

তুরস্ক, সৌদি আরব, কাতার, আরব আমিরশাহী শুধু এই কাজে অর্থ জুগিয়েছে তা নয় আমেরিকার পরিকল্পনা অনুযায়ী আফগানিস্তান, চেচনিয়া সহ বিভিন্ন দেশের সন্ত্রাসবাদী এবং লিবিয়ার গদ্দাফি বিরোধী খুনে বাহিনীকে প্রথমে বিমানে করে তুরস্কে এনে রাখা হয়, তারপর ইজরায়েল ও তুরস্কের সেনানায়কদের তত্ত্বাবধানে তাদের সিরিয়ায় ঢোকানো হয়। (ডেইলি টেলিগ্রাফ ১২ জুন ২০১৪) সিরিয়ায় অন্যান্য দেশের মতোই সরকার বিরোধী বিক্ষোভ ছিল, তাকে এই শক্তিগুলি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে পরিণত করে। এভাবেই আল কায়দার মদতপুষ্ট ফ্রি সিরিয়ান আর্মি, জাভাত অল নুসরা, আহরার অল সাম-এর মতো সংগঠনগুলির জন্ম। মার্কিন শাসকরা মডারেট (লঘু) সন্ত্রাসবাদের তত্ত্ব আবিষ্কার করে সিরিয়া সরকারের বিরুদ্ধে এই শক্তিগুলিকে কাজে লাগায়। এগুলিই এখন মিলে গিয়ে আইসিস-এর ছত্রছায়ায় এসেছে। প্রসঙ্গত মনে করিয়ে দেওয়া দরকার, প্যারিসের ভয়াবহ হানার ঘটনার পর আইসিস বিরোধী হুঙ্কার ছাড়ছে যে ফ্রান্স তার বিদেশ দপ্তর এই বছর জুলাই মাসে এক বিবৃতিতে বলেছিল, সন্ত্রাসের প্রশ্নে তুরস্ক এবং ফ্রান্স একই দিকে আছে। বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির এই ভূমিকাই সন্ত্রাসবাদকে শক্তি জুগিয়েছে। আজ ইরাক, সিরিয়ার কোটি কোটি নাগরিকের সাথে ফ্রান্সের জনগণও তার মূল্য দিচ্ছে।

শুধু অস্ত্র কিনতে অর্থ জোগানো নয়, আরব দুনিয়ার ধনকুবেরেরা বিশেষত সৌদি আরবের শাসকরা বিদ্বেষমূলক ও হিংস্র ওয়াহাবি সালাফি মতবাদকে মদত দিয়ে মৌলবাদী চিন্তার প্রসারে অকাতরে খরচ করে চলেছে। এই ওয়াহাবি মতবাদই মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকায় 'খিলাফত' বা খলিফার রাজত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াইতে আইসিসকে মতাদর্শগত ভিত্তি জোগাচ্ছে। আরব দুনিয়ায় আরব আমিরশাহি, সৌদি আরব, কাতার, জর্ডনের মতো যে সব দেশের শাসকরা এই মৌলবাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক তাদের প্রধান মিত্র হল আমেরিকা-ব্রিটেন-জার্মানি-ফ্রান্সের মতো ন্যাটোর মাথারা। এই সাম্রাজ্যবাদীরা আফগানিস্তান থেকে ইরাক হয়ে সিরিয়া এবং আফ্রিকার নানা দেশে যেখানেই আপাত অর্থে গণতান্ত্রিক এবং সেকুলার চিন্তা মাথা তুলেছে সেখানেই তার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র চালিয়ে মৌলবাদীদের হাত শক্ত করেছে। কয়েক বছর আগে আরব দুনিয়াতে নিজ নিজ দেশের শাসকদের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল তীব্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। যাকে অভিহিত করা হয়েছিল 'আরব বসন্ত' হিসাবে। বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মৌলবাদীরা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব কবজা করে নেয়, আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যায়। এই এই জমিতেই শক্তি অর্জন করছে।

আইসিস-এর আয়ের অন্যতম উৎস হল দখলীকৃত অঞ্চল থেকে ট্যাক্স আদায়, প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রীর চোরাচালান এবং ব্যাঙ্ক ইত্যাদি লুঠ। এই চুরি করা সামগ্রী কিনছে কারা? তথাকথিত উন্নত বিশ্বের ক্রেতারাই তো এর প্রধান সংগ্রাহক! সেই চোরাচালান আটকাতে মার্কিন ব্রিটিশ শক্তি কী করেছে! তারা এতদিন ধরে একের পর এক ঐতিহাসিক সৌধ এবং প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শগুলির ধ্বংস সাধন নীরবে দেখেছে। আজ সেই ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন যখন স্রষ্টার বিরুদ্ধেই আঘাত হানছে তখন সাম্রাজ্যবাদীরা সন্ত্রাসবাদীদের ধ্বংস করার হুঙ্কার দিচ্ছে। ভণ্ডামি ছাড়া একে কী-ই বা বলা যায়।

আমেরিকায় স্বপ্নের মধ্যবিত্ত ক্রমেই কমছে

মার্কিন দেশে প্রবাদের মতো বলা হত 'মিডলক্লাস ড্রিম', অর্থাৎ মধ্যবিত্তের স্তরে পৌঁছাবার অফুরান সুযোগ রয়েছে ওই দেশে, অতএব, ওই স্তরে পৌঁছতে স্বপ্ন দেখে নাগরিকরা। কিন্তু সেদিন এখন অতীত। মাঝারি আয়ের মানুষ আজ আর মার্কিন সমাজের বড় অংশের শরিক নয়। সম্প্রতি 'পিউ রিসার্চ সেন্টার'-এর একটি সমীক্ষার রিপোর্ট এ কথাই বলছে। দেখা যাচ্ছে, আমেরিকায় উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত— এই দুই ধরনের মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। কমে গেছে মধ্যবিত্ত। অর্থাৎ কিছু সংখ্যক মানুষ আরও বেশি ধনী হয়েছে, বাকিদের বিত্ত ঠেকেছে তলানিতে। বেড়েছে আর্থিক বৈষম্যের মাত্রা।

সমীক্ষা আরও দেখিয়েছে, ১৯৮৩-২০১৩ — এই তিরিশ বছরে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলির আয় ও সম্পদের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে গেছে। ওই একই সময়ে উচ্চবিত্ত পরিবারগুলির আয় ও সম্পদ চোখে পড়ার মতো বেড়েছে। অন্য দিকে মধ্য আয়ের মানুষের সংখ্যা কমার পাশাপাশি তাদের উপার্জন ও ধনসম্পত্তির পরিমাণও যথেষ্ট কমে গেছে। হিসাব বলছে, ২০০০-২০১৪— এই সময়ে মধ্যবিত্তদের গড় আয় কমেছে ৪ শতাংশ এবং সম্পদের পরিমাণ কমে গেছে গড়ে ২৮ শতাংশ।

আমেরিকার মোট আয়ের কতটা অংশ কাদের দখলে, এ নিয়েও তথ্য প্রকাশ করেছে 'পিউ' সমীক্ষা। দেখা যাচ্ছে, ১৯৭০ সালে সে দেশের উচ্চবিত্তরা দেশের বার্ষিক মোট আয়ের ২৯ শতাংশ অধিকার করে রাখত। ২০১৪-তে তাদের দখলে চলে এসেছে দেশের মোট আয়ের ৪৯ শতাংশ। পাশাপাশি ওই সময়ের মধ্যে মধ্য আয়ের মানুষের দখল মোট আয়ের ৬২ শতাংশ থেকে কমে ৪৩ শতাংশে নেমে গেছে।

'পিউ' সমীক্ষা আরও দেখিয়েছে, আমেরিকায় আয়-বণ্টনের দুই প্রান্তে থাকা অতি ধনী ও অতি দরিদ্র — এই দুই শ্রেণির মানুষের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বেড়েছে। দেখা যাচ্ছে, আমেরিকায় ১৯৭১ সালে সবচেয়ে কম আয়ের স্তরে ছিলেন ১৬ শতাংশ মানুষ। ২০১৫-তে এই স্তরে চলে এসেছেন ২০ শতাংশ। আবার ওই ১৯৭১ সালে সর্বোচ্চ আয়ের স্তরে ছিলেন ৪ শতাংশ, যা ২০১৫-তে পৌঁছেছে ৯ শতাংশে। আমেরিকায় শুরু হয়ে ২০০৮ সালের যে ভয়ঙ্কর আর্থিক মন্দা গোটা দুনিয়ার অর্থনীতিতে ধস নামিয়েছে, 'পিউ'-এর সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, তার আঁচ বিশেষ লাগেনি মার্কিন ধনপতিদের গায়ে। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, উচ্চবিত্তদের সম্পদ ১৯৮৩ সালের তুলনায় ২০০৭ সালে দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছিল। মন্দার ধাক্কা সামলাবার পর ২০১৩ সালে সেই সম্পদের পরিমাণ কিছুটা কমলেও '৮৩ সালে যা ছিল, তার প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছিই রয়েছে।

সামগ্রিকভাবে সমীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করে 'পিউ'-এর সিদ্ধান্ত — ২১ শতকের শুরুতে যেমন ছিল, সাধারণ মার্কিন নাগরিকরা এখন মোটের উপর তার চেয়ে খারাপ আর্থিক অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। কারণ হিসাবে সমীক্ষকরা ২০০১-এর আর্থিক দৈন্য ও ২০০৮-এর মহামন্দাকেই দায়ী করেছেন, যার কবল থেকে মার্কিন অর্থনীতি এখনও বেরোতে পারেনি।

বাস্তবে পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়মে আমেরিকায় হাতে গোনা ধনকুবেরদের হাতেই বিপুল সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। আগেকার সমস্ত রেকর্ড ভেঙে তাদের আয় আকাশ ছুঁয়েছে। এ দিকে নিঃস্বতর হতে থাকা মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। গত বছর অধ্যাপক ইমানুয়েল সায়েজ এবং অধ্যাপক গ্যাব্রিয়েল জুম্যান তাঁদের গবেষণার রিপোর্টে দেখিয়েছিলেন, মার্কিন সমাজের সবচেয়ে ধনী ০.৫ শতাংশ মানুষের সম্পদ ১৯৭৮ সালে যা ছিল, ২০১২-তে তার দ্বিগুণ হয়েছে। সেদেশের সর্বোচ্চ পরিমাণ সম্পদের অধিকারীরা জনসংখ্যার মাত্র ০.১ শতাংশ মানুষ। গোটা দেশের মোট সম্পদের ২০ শতাংশই রয়েছে ০.১ শতাংশ ধনকুবেরদের হাতে।

মধ্যবিত্ত মানুষের সংখ্যার এই ক্রম হ্রাসের পিছনে রয়েছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গভীর সংকট। আমেরিকাকে বিশ্ব পুঁজিবাদের ইঞ্জিন, শিল্পে সর্বোন্নত দেশ বলে গণ্য করা হয়েছে বহুকাল। সেই আমেরিকায় শিল্পের বিকাশের গতি প্রায় রুদ্ধ। আজকের ধনকুবেরেরা বড় বড় শিল্প কারখানা খোলার মধ্য দিয়ে ধন সঞ্চয় করছে তা নয়, অধিকাংশ ধনকুবেরেরই বিপুল মুনাফার উৎস টাকাকড়ির বাজার বা সুদের বাজার। বস্তুত বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থার আজকের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ফিনান্সের কারবার। নতুন নতুন শিল্প নেই, ফলে চাকরিও নেই। তার উপর মন্দার জন্য বাজার নেই, অতএব শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা দূরের কথা, মার্কিন অর্থনীতিতে এখন মজুরি হ্রাসের জোয়ার। এর ফলেই মুষ্টিমেয় ধনকুবেরদের বাদ দিলে মধ্যবিত্তের আয় নিম্নমুখী। বেকার বাড়ছে ক্রমাগত। খুব ধীরে ধীরে শ্রমিক আন্দোলন একটু একটু করে মাথা তুলছে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শের চর্চা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মার্কিন অর্থনীতি যত বড়ই হোক, পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বাভাবিক সংকট থেকে তার রেহাই নেই।

(সূত্র ঃ আন্দ্রে দামান, ওয়ার্ল্ড সোস্যালিস্ট ওয়েবসাইট)

ধান ক্রয়কেন্দ্রের দাবিতে কৃষক বিক্ষোভ গোসাবায়

রাজ্য সরকার ধানের সহায়ক মূল্য ঘোষণা করেই খালাস, ধান কেনার উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলেনি। এই সুযোগে চাষিদের কম দামে ধান বিক্রি করতে বাধ্য করছে ব্যবসায়ীরা। সরকারি উদ্যোগে ধান কেনার দাবিতে কোথাও কৃষক সংগঠন কে কে এম এস আন্দোলন করছে, কোথাও এস ইউ সি আই (সি)। ২৩ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই (সি) গোসাবা লোকাল কমিটি ব্লকের প্রত্যেকটি দ্বীপে ধান ক্রয়কেন্দ্র চালু করার দাবিতে বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দ্বীপবহুল ব্লক গোসাবার কোথাও সরকারি ধান ক্রয়কেন্দ্র নেই। এই কর্মসূচি উপলক্ষে গোসাবা বাজার, সাতজেলিয়া, মোল্লাখালি, বেলতলি প্রভৃতি দ্বীপে মিছিল এবং মাইকে প্রচার করা হয়। নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার ধান ক্রয়কেন্দ্র না করে পরিকল্পিতভাবে ফড়েদের সুবিধা করে দিচ্ছে। এদিনের ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেডস চন্দন মাইতি, তপন মিস্ত্রি, বিকাশ শাসমল, করুণা মণ্ডল, গৌতম দত্ত।

ধান ক্রয় ঃ পরিকাঠামোর দাবিতে কোলাঘাটে বিক্ষোভ

ধান ক্রয়ের সঠিক পরিকাঠামোর দাবি আদায় করলেন কোলাঘাটের চাষিরা। ব্লকে কৃষক মাণ্ডি নেই বলে কোলাঘাট ব্লকে দেউলবাড়ে খোলা আকাশের নিচে কোনও প্রচার ছাড়াই ধানক্রয় কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। প্রচারের অভাবে চাষিরা এই কেন্দ্রের কথা জানতে না পারায় তার সুযোগ নিচ্ছে ফড়েরা। আর্দ্রতা পরিমাপক যন্ত্র না থাকায় ধান বিক্রির ক্ষেত্রে চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এমনকী পাকা মেঝে না থাকায় ধান রাখার বস্তাও চাষিদেরই দিতে হচ্ছে। তার উপর এই কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ বিগত মরশুমের বোরো ধান কিনতে অস্বীকার করছেন। এর প্রতিবাদ জানিয়ে ২৮ ডিসেম্বর কৃষক সংগ্রাম পরিষদের ডাকে বহু চাষি ধানক্রয় কেন্দ্রের আধিকারিকদের ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। দু'ঘন্টা ঘেরাও চলার পর ব্লক খাদ্য পরিদর্শক এবং মিল মালিক দাবিগুলি মেনে নিতে বাধ্য হন। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন পরিষদের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, সহ সম্পাদক তপন কুমার মাইতি, গোবিন্দ পড়িয়া, ভীম সাঁতরা প্রমুখ।

একই দাবিতে ১৮ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই (সি)-র কোলাঘাট ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিম মেদিনীপুরে পরিচারিকা সম্মেলন

(সংবাদ দুয়ের পাতায়)

ডি ওয়াই ও-র উদ্যোগে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও-র রাসবিহারী-আলিপুর আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে ২৭ ডিসেম্বর একদিনের নক্ আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দিলীপ হালদার, আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি কমরেড স্বস্তিকা মণ্ডল, সম্পাদক কমরেড অরুণকুমার ব্যানার্জী ও অন্য সদস্যরা।

৮টি দলে ৮ জন করে খেলোয়াড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। খেলায় দর্শক সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো। রানার্স আপ টিম 'চাক দে ইন্ডিয়া'-র হাতে রানার ট্রফি তুলে দেন কমরেড অরুণকুমার ব্যানার্জী এবং 'মা সারদা স্পোর্টিং ক্লাব'-এর হাতে উইনার ট্রফি তুলে দেন কমরেড দিলীপ হালদার। তিনি সমাজকে সুস্থ, সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য সকলকে খেলাধূলা ও নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রসারে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত

২৮ থেকে ৩১ ডিসেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে কেন্দ্রীয় কমিটি একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার সদস্যরা হলেন—

১) কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার
২) কমরেড ছায়া মুখার্জী
৩) কমরেড শঙ্কর সাহা
৪) কমরেড সত্যবান
৫) কমরেড সি কে লুকোস
৬) কমরেড গোপাল কুণ্ডু
৭) কমরেড সৌমেন বসু
৮) কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ

শারীরশিক্ষায় প্রশিক্ষিতদের চাকরির দাবিতে সোচ্চার বিধায়ক তরুণকান্তি নস্কর

১৬ ডিসেম্বর বিধানসভায় এস ইউ সি আই (সি) বিধায়ক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর বলেন, গত ১৯ মার্চ ২০১৪ রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল ২০১৬ সাল থেকে শারীর শিক্ষা সেকেন্ডারি স্তরে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে চালু হবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের ২০১৪-১৫ সালের তথ্য অনুযায়ী রাজ্যে ৪৩৩২টি উচ্চ প্রাথমিক, ৮৬৩টি মাধ্যমিক এবং ১২১৩টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কোনও শারীর শিক্ষার শিক্ষক নেই। শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী ১০০ জনের বেশি ছাত্র-ছাত্রী যুক্ত উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক জন শারীর শিক্ষার, এক জন কর্মশিক্ষার এবং এক জন ক্র্যাফটের শিক্ষক থাকা বাধ্যতামূলক। রাজ্যে প্রায় ৭০ হাজার বি পি এড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী চাকরির অপেক্ষায় আছেন। তাঁদের মধ্য থেকে এই শূন্য পদগুলি পূরণ করার দাবিতে তিনি স্কুলশিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

নির্ভয়া স্মরণে কলকাতায় এম এস এসের সভা

২৯ ডিসেম্বর কলকাতার মৌলালিতে এ আই এম এস এসের উদ্যোগে নির্ভয়া স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। নেতৃবৃন্দ মহিলাদের উপর অত্যাচারের ক্রমবর্ধমান ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং তা প্রতিহত করতে জনসাধারণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান

মেদিনীপুরে জেলাশাসক দপ্তরে মহিলা বিক্ষোভ

মদ, জুয়া, অশ্লীল পত্রপত্রিকা, বিজ্ঞাপনে নগ্ন নারীদেহ প্রদর্শন, খুন ধর্ষণের প্রতিবাদে ২৯ ডিসেম্বর এ আই এম এস এসের নেতৃত্বে মহিলারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাশাসক দপ্তর অভিযান করেন।

চিটফান্ড আমানতকারী ও এজেন্টদের সভা বসিরহাটে

অল বেঙ্গল চিটফান্ড ডিপোজিটার্স অ্যান্ড এজেন্ট ফোরামের বসিরহাট মহকুমা কমিটির উদ্যোগে ৩০ ডিসেম্বর রবীন্দ্র ভবনে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন নৃপেন মিস্ত্রি। প্রায় ১০০০ আমানতকারী ও এজেন্ট উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের সম্পাদক প্রধান বক্তা বিশ্বজিৎ সাঁপুই সহ উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সম্পাদক গৌতম দত্ত, আমানতকারী শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য, সংগঠক জ্যোতির্ময় মণ্ডল, গৌতম মণ্ডল, নরেন্দ্র নাথ দত্ত প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। জানুয়ারি মাস ব্যাপী প্রতিটি ব্লকে থানা ও বিডিওতে ডেপুটেশন এবং বসিরহাট মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

সামাজিক প্রকল্পে ব্যাপক বরাদ্দ ছাঁটাই

আচ্ছে দিনই বটে ! তবে কার জন্য

নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি 'আচ্ছে দিন' নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকারে বসেছিল। বিভিন্ন সভায় তিনি বাণী দিয়ে চলেছেন 'দলিত আমার ভাই', গরিব আমার ভাই'। তার সরকার নাকি দেশের গরিব মানুষের দুঃখে বড়ই কাতর। তাদের দুঃখ দূর করতেই তিনি সদাব্যস্ত ! দেড় বছরে কেমন 'আচ্ছে দিন' এনেছেন মোদিজি !

সামাজিক উন্নয়নমূলক যে সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুফল কিছুটা হলেও গরিব-নিম্নবিত্ত মানুষের কাছে পৌঁছত, তার সংখ্যা এক ধাক্কায় ৫৫ থেকে নামিয়ে এনেছেন ২৭টিতে। বলা হচ্ছে দারিদ্র দূরীকরণ, গ্রামে আয়ের সুযোগ তৈরি, সমাজের একেবারে পিছিয়ে থাকা মানুষদের সাহায্য, চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও রোগ নিয়ন্ত্রণের দিকে তাকিয়েই নাকি সরকার ১০টি প্রকল্পকে বেছে নিয়েছে। বাকি ১৭টি কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ সহায়তায় চলবে। সাহায্য কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে মিড ডে মিল, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, আই সি ডি এস, গ্রামীণ পানীয় জল, কৃষি বিকাশ যোজনা, সর্বশিক্ষা অভিযান, স্বচ্ছ ভারত অভিযান প্রভৃতি প্রকল্পে। গরিব-নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের সাথে সরাসরি যোগ আছে এমন প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে এখন থেকে শতকরা ৬০ ভাগ অর্থ দেওয়ার ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। বাকি ৪০ ভাগ রাজ্যের ঘাড়ে। অর্থাৎ কেন্দ্রের রাজ্যকে এবং রাজ্যের কেন্দ্রকে কাজ না হওয়ার ক্ষেত্রে দোষারোপ করার সুযোগ রইল এবং নিজেদের দায় অস্বীকার করারও সুযোগ রইল।

দেশের সর্বাধিক বিত্তশালী প্রথম ১ শতাংশের হাতে রয়েছে দেশের মোট সম্পদের ৫৩ শতাংশ। কেন্দ্রের পূর্বতন কংগ্রেস সরকার এবং বর্তমান বিজেপি সরকার ঋণ মকুব করে চলেছে এই ধনকুবেরদের। এদেরই জন্য দানছত্র খুলে রেখেছে সরকার। পুঁজিপতিদের 'দুঃখে' কর্পোরেট ট্যাক্সের হার আগামী চার বছরের জন্য ২৫ শতাংশ কমিয়েছে বিজেপি সরকার। প্রত্যাহার করা হয়েছে সম্পত্তি কর।

গরিব মানুষ মরে মরুক !

টাকার অভাবে কেন্দ্রীয় সরকার কি এই প্রকল্পগুলিতে ভর্তুকি প্রত্যাহার করছে? তা হলে তারা ধনীদের ভর্তুকি দিচ্ছে কীভাবে? ধনীদের কীরকম ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে? শুনলে চমকে উঠবেন অনেকেই। আর্থিক সমীক্ষক সংস্থা ক্রেডিট সুইসের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত সর্বশেষ রিপোর্টে জানা যাচ্ছে, দেশের সর্বাধিক বিত্তশালী প্রথম ১ শতাংশের হাতে রয়েছে দেশের মোট সম্পদের ৫৩ শতাংশ। পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের মতোই বর্তমান বিজেপি সরকার ঋণ মকুব করে চলেছে এই ধনকুবেরদের। এদেরই জন্য দানছত্র খুলে রেখেছে সরকার। পুঁজিপতিদের 'দুঃখে' কর্পোরেট ট্যাক্সের হার আগামী চার বছরের জন্য ২৫ শতাংশ কমিয়েছে বিজেপি সরকার। প্রত্যাহার করা হয়েছে সম্পত্তি কর। পরিকাঠামো নির্মাণ ক্ষেত্রগুলিতে ৭০ হাজার কোটি টাকা ট্যাক্স মকুব করা হয়েছে। মোদির প্রথম বছরেই কর্পোরেট ইনকাম ট্যাক্সে ৬২ হাজার ৩৯৯ কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে, যা ইউ পি এ সরকারের সর্বশেষ ভর্তুকি ৫৭ হাজার ৭৯৩ কোটি টাকা থেকে অনেকটাই বেশি। বিজেপি সরকারের ১৫-১৬-র বাজেটে সোনা, হিরে এবং গয়নাতে কাস্টমস ডিউটিতে ৭৫ হাজার ৫৯২ কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে, যা '১০০ দিনের প্রকল্পে' বরাদ্দের দ্বিগুণ। বড় বড় শিল্প মালিকদের, ধনকুবেরদের জন্য বিদ্যুৎ, জল, জমি প্রায় বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে এবং হাজার হাজার কোটি টাকা ট্যাক্স ছাড় দিয়ে চলেছেন প্রতিনিয়ত, তাহলে কি সাধারণ মানুষের জন্যই সরকারের ভাঁড়ার শূন্য? সেজন্য 'ভিক্ষা'র দান বাজেটের মাত্র ০.০১ শতাংশ সামাজিক প্রকল্পগুলিতে বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার।

মার্চ মাসে ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষের বাজেটে শিশুশিক্ষা, উন্নয়ন, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বরাদ্দে বিপুল ছাঁটাই করে মোদি সরকার। তখনই সরকারের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যায়। তা আরও নগ্ন হল জনকল্যাণ মূলক খাতে ব্যাপক বরাদ্দ ছাঁটাইয়ে। শিশুশিক্ষার বাজেট গত বছরের ৮১,০৭৫.২৬ কোটি থেকে কমিয়ে ৫৭,৯১৮.৫১ কোটি টাকা করা হয়েছে। কয়েক কোটি শিশু যখন স্কুলশিক্ষার আওতার বাইরে, তখন বরাদ্দ হ্রাস কীসের ইঙ্গিত? ১০ কোটি শিশু ও মহিলা আই সি ডি এস প্রকল্পের মাধ্যমে কিছুটা হলেও উপকৃত হতেন। এতে গত বছর বরাদ্দ ছিল ১৮,১৯৫ কোটি, এ বছর কমিয়ে করা হয়েছে ৮,৩৩৫.৭৭ কোটি। মহিলাদের সুরক্ষার জন্য সরকার নাকি ভীষণ চিন্তিত ! অথচ নারীকল্যাণ বাজেট হ্রাস করা হয়েছে প্রায় ২৫ শতাংশ। মিড ডে মিলে গত বছর ছিল ১৩,২১৫ কোটি টাকা, এ বছর তা কমিয়ে করা হয়েছে ৯,২৩৬ কোটি টাকা। গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কিছুটা সহায়ক ১০০ দিনের প্রকল্পকে প্রায় তুলে দেওয়ার পথেই হাঁটছে মোদি সরকার। ১২৭ কোটির দেশ ভারত অপুষ্টিতে যখন লজ্জাজনকভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, মানব উন্নয়ন সূচকে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দারিদ্রের নিরিখে এই সূচক) যখন ভারত ১৩৫ তম স্থান অধিকার করে পিছনের সারিতে থেকে মুখ লুকনোর চেষ্টা করছে, তখন ভারতের মন্ত্রী ও নেতারা 'ডিজিটাল' ভারতের জয়গান গাইছেন। এর থেকে লজ্জার আর কী আছে ! এ বছর প্রকাশিত পুষ্টি সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক রিপোর্ট যেখানে বলছে, ভারতে অপুষ্ট শিশুর সংখ্যা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি— দেশের পাঁচ বছরের কম বয়সী ৩৯ শতাংশ শিশুই তাদের বয়সের তুলনায় বেঁটে এবং তার একমাত্র কারণ অপুষ্টি— তখন সামাজিক প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়া এবং বাজেট ছাঁটাই মোদি সরকারের জনস্বার্থবিরোধী চরিত্রকে দেশের মানুষের কাছে আরও উন্মোচিত করে দিল। শত বিদেশ সফরের ঢক্কানিনাদেও তা চাপা দিতে পারবেন না মোদিজি।

তার 'আচ্ছে দিনে'র স্লোগান ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিব-নিম্নবিত্ত মানুষদের প্রতি ছলনা, আর ঝাঁ চকচকে অত্যাধুনিক স্মার্ট সিটি ও ডিজিটাল ভারতের অল্পসংখ্যক নাগরিকদের ক্ষেত্রে উপহার।

যথার্থ ফ্রি চিকিৎসার দাবি চিকিৎসকদের

ফ্রি চিকিৎসার নামে সরকারি হাসপাতালে যে চূড়ান্ত অরাজকতা চলছে তা বন্ধ করে যথার্থ ফ্রি চিকিৎসার দাবিতে ৩০ ডিসেম্বর এস এস কে এম হাসপাতালের ডিরেক্টরের দপ্তরে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে বিক্ষোভ ডেপুটেশন সংগঠিত হয়। ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মী সহ রোগীর পরিজনেরা তাতে সামিল হন। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অংশুমান মিত্র বলেন, পরিকাঠামো তৈরি না করেই রাজ্য সরকার একটার পর একটা চটকদার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার ফলে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবার বেহাল অবস্থা বেড়েছে। ফ্রি চিকিৎসার কথা ঘোষণা করা সত্ত্বেও হাসপাতালে ইনসুলিন, অ্যাসপিরিন, নেবুলাইজেশন, অ্যানালজেসিক, অ্যান্টি ম্যালেরিয়া ড্রাগ প্রভৃতির মতো ন্যূনতম ও জীবনদায়ী ওষুধগুলির সাপ্লাই নেই। যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম না থাকায় মাসের পর মাস রোগীর অপারেশন হচ্ছে না। অথচ কী নেই তা কোনও ভাবেই বাইরে প্রকাশ করা যাবে না। প্রকাশ হয়ে গেলে ডাক্তারদের শো-কজ-এর হুমকি দেওয়া হচ্ছে। হাসপাতালে ডিজিটাল এক্সরে, সি টি স্ক্যান সহ পি পি পি মডেলে গড়ে ওঠা কেন্দ্রগুলিতে রোগীদের টাকার বিনিময়েই পরিষেবা কিনতে হচ্ছে। এই চূড়ান্ত অব্যবস্থার ফলে একদিকে যেমন রোগীদের জীবন বিপন্ন হচ্ছে অন্য দিকে সরকার ডাক্তারদের বাধ্য করছে চূড়ান্ত অনৈতিক ভাবে এই অরাজকতা ধামা চাপা দিয়ে 'সব ভালো আছে' বলতে। সমস্যাগুলি অবিলম্বে সমাধান করা না হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবেন বলে জানান ডাঃ মিত্র।

হরিয়ানায় শহিদ ভগৎ সিং বিমানবন্দরের নাম বদল, প্রতিবাদ

স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর শহিদ ভগৎ সিংয়ের নামাঙ্কিত চণ্ডীগড় বিমানবন্দরের নাম পাল্টে বিজেপি নেতা ডাঃ মঙ্গল সেনের নামে করার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে চণ্ডীগড় জনসংঘর্ষ কমিটি ২৯ ডিসেম্বর রাজ্য সচিবালয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। শহিদদের প্রতি অবমাননা সূচক এই সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রথিতযশা ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে এক স্মারকলিপি হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে প্রেরণ করা হয়।

বিভিন্ন দাবিতে গোপালগঞ্জ পঞ্চায়েত দপ্তর ঘেরাও

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় সিপিএম পরিচালিত গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতে ব্যাপক দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ, দলবাজির প্রতিবাদে এবং প্রতি গ্রামে ইটের রাস্তা, টিউবওয়েল ও বিদ্যুৎ, সকলের জন্য রেশন কার্ড, সমস্ত বয়স্ক দরিদ্র মানুষের বার্ধক্য ভাতা ও বিধবা ভাতা প্রদান, নতুন জবকার্ড প্রভৃতি দাবিতে এস ইউ সি আই (সি) গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কমিটির নেতৃত্বে ২৯ ডিসেম্বর পঞ্চায়েত ঘেরাও করা হয়। পাঁচ শতাধিক মানুষ এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। পঞ্চায়েতে বিরোধী দলনেতা কমরেড রতন নস্কর এবং গোপালগঞ্জ ১নং লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড শঙ্কর নস্করের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে দাবিসনদ পেশ করেন। ঘেরাও অবস্থানের সভায় বিভিন্ন বক্তা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রদীপ হালদার। অঞ্চল প্রধান দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে নেন এবং অবিলম্বে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন।

দোকানদারদের উচ্ছেদ আটকাল কল্যাণ সমিতি

নেতা থাকলেই আন্দোলন হয় না। 'কাজের মানুষ কাছের মানুষ' তকমা নিয়েও হয় না। কোন নেতা জনগণকে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবেন, আর কে আন্দোলনে জল ঢেলে দেবেন তা নির্ভর করে নেতা যে দলটির সঙ্গে যুক্ত তার চরিত্রের উপর। সদ্যশেষ হওয়া বছরের শেষ সপ্তাহে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হাউড় স্টেশনে একটি ঘটনায় এমনই ছবি উঠে এল।

২২ ডিসেম্বর এই স্টেশন সংলগ্ন প্রায় ১৫০টি দোকান ভাঙার নোটিস দেয় রেল প্রশাসন। সেই নোটিস পেয়ে দোকানদাররা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ইতিপূর্বে সেপ্টেম্বর মাসে ওই দোকানগুলি ভাঙার নোটিস দিলে স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতারা দোকানদারদের দিয়ে একটি মুচলেকা লিখিয়ে রেল প্রশাসনকে দেন যে তাঁরা দুর্গাপুজার পর নিজেরাই দোকান ভেঙে নেবেন। পুজার পর কিছু দোকানদার চালের আচ্ছাদন নিজেরাই খুলে নেন। রেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সমস্ত দোকান খুলে জায়গা পরিষ্কার করার জন্য চাপ দিলে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা দোকানদারদের পাশে দাঁড়াতে চাননি। তখন দোকানদাররা দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে দোকানদার কল্যাণ সমিতির সাথে যোগাযোগ করেন। উক্ত সমিতির পক্ষ থেকে দোকানদারদের নিয়ে ২২ ডিসেম্বর স্টেশন চত্বরে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা হয়।

এই প্রতিরোধের সামনে রেল প্রশাসন পিছু হঠতে বাধ্য হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জাতীয় হকার নীতি অনুযায়ী পুনর্বাসন না দিয়ে উচ্ছেদ করা চলে না। উচ্ছেদ স্থগিত হওয়ায় দোকানদারদের মধ্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়, তাঁরা ওই দিনই সমিতির হাউড় শাখা কমিটি গঠন করে সমিতির প্রতি দৃঢ় আস্থা জ্ঞাপন করেন। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সমিতির সভাপতি মহম্মদ কামাল, সহ সভাপতি মধুসূদন বেরা ও শঙ্কর মালাকার, সম্পাদক গোপাল মাইতি প্রমুখ।

মহিষের মাংসে বিজেপির আপত্তি নেই কেন

গোহত্যাতে তাঁদের আপত্তি, মহিষ হত্যায় নয়। গো মাতা, কিন্তু মহিষ মাতা, পিতা, খুড়ো, খুড়ি বা নিদেন পক্ষে পিসি-ও নয়। কেন? গরু দুধ দেয়, বলদ চাষের কাজে লাগে। মহিষও তাই। বরং বেশি দুধ দেয়, বেশি ওজনের মাল টানতে পারে। তা হলে মহিষকে মাতা বলতে তাঁদের আপত্তি কেন? হ্যাঁ, সংঘ পরিবার এবং বিজেপি বাহিনীর আপত্তির কথাই হচ্ছে। গরু এবং মহিষের মধ্যে এমন বৈষম্যমূলক পক্ষপাতিত্বের অবশ্য একটা ব্যাখ্যা নির্বাচন কমিশনের দেওয়া একটি তথ্য থেকে উঠে এসেছে। দেখা যাচ্ছে, মহিষকেও মা মানলে সংগঠনের সমূহ আর্থিক ক্ষতি রয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, ২০১৩ থেকে ২০১৫-এর মধ্যে বিজেপি আড়াই কোটি টাকা 'অনুদান' হিসেবে নিয়েছে এমন যে কয়েকটি কোম্পানি থেকে যাদের কারবার বিদেশে মহিষের মাংস রপ্তানি করা। ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে ফ্রিগোরিফিকো আল্লানা লিমিটেড, ফ্রিগেরিও কনভার্জা আল্লানা লিমিটেড এবং ইনডঅ্যাগ্রো ফুডস লিমিটেড, এই তিনটি কোম্পানিই গেরুয়া বাহিনীকে দিয়েছে দু'কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ বছরে ফ্রিগোরিফিকো আল্লানা লিমিটেড পার্টি ফান্ডে দিয়েছে ৫০ লক্ষ টাকা।

দেখা যাচ্ছে, বিজেপি আমলে মাংস রপ্তানি আগের থেকে অনেক বেড়েছে। ২০১৩ সালের হিসেবে দেখা যাচ্ছে, এপ্রিল থেকে নভেম্বরে মহিষের মাংস রপ্তানির পরিমাণ ২,৭৬৭.১১ মিলিয়ন ডলার। আর ২০১৪-র এপ্রিল থেকে নভেম্বরে রপ্তানির পরিমাণ ৩,২২৮.৬৯ মিলিয়ন ডলার। বিশ্বে ভারতই এখন মহিষের মাংস রপ্তানিতে প্রথম। গত বছর এমনকী তা বাসমতি চাল রপ্তানিকেও ছাড়িয়ে গেছে।

বিজেপি নেতারা এটা চলতে দিচ্ছেন কী করে? গোমাতায় যাদের এত ভক্তি, মহিষে তাদের সে ভক্তির ছিটেফোঁটাও দেখা যাচ্ছে না কেন? নাকি পার্টি ফান্ডে শত শত কোটি টাকা আয় হলে তখন ভক্তিটা সেই ফান্ডেই বেশি হয়! ২০১৪-১৫ বছরে বিজেপির পার্টি ফান্ডে ঘোষিত আয়ের পরিমাণ দেশে সব চেয়ে বেশি। উল্লেখ্য, কুড়ি হাজার টাকার বেশি দেওয়া দানের হিসেবে তাদের এই এক বছরে আয়ের পরিমাণ ৪৩৭.৩৫ কোটি টাকা।

নন্দীগ্রামে পুলিশ কর্তারা পুরস্কৃত হচ্ছেন

একের পাতার পর

কলকাতা পুলিশের ই এস ডি বিভাগ সামলে প্রথমে ডি আই জি হিসেবে ব্যারাকপুরে কিছুদিন কাটিয়ে এখন মালদা রেঞ্জের দায়িত্বে। দেবাশিসবাবু প্রথমে এস এস (সি আই ডি), তারপর খড়্গপুরের রেলপুলিশ সুপার হন। সম্প্রতি তাঁকে গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান পদে নিয়ে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ভাঙাবেড়া ব্রিজের কাছে গুলিচালনার ঘটনায় উপস্থিত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তৃণমূল আমলে প্রোমোশন দিয়ে রাজ্য সশস্ত্র পুলিশের ডি আই জি করা হয়। হলদিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তন্ময় রায়চৌধুরী হুগলির পর এখন উত্তর চব্বিশ পরগণার মতো গুরুত্বপূর্ণ জেলার পুলিশ সুপার। ২০০৭ সালে গুলি চালনার ঘটনার সময় পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার ছিলেন গঞ্জি শ্রীনিবাসন। তাঁকে তৃণমূল আমলে দেওয়া হয়েছে টেলিকম বিভাগের সুপার পদ। রাজ্য পুলিশ সূত্রের খবর, শুধু আই পি এস কর্তারাই নন, নন্দীগ্রাম থানার তৎকালীন ও সি শেখর রায়ও তৃণমূল শাসনে প্রোমোশনের পর বিধাননগর কমিশনারেটের ইনস্পেক্টর পদে এবং খেজুরি থানার ওসি অমিত হাতি বাঁকুড়া জেলার ডি আই বি-তে যান।

সিবিআই নন্দীগ্রামে গুলিচালনা নিয়ে যে রিপোর্ট পেশ করে তা সম্পূর্ণ সাজানো। তাতে অভিযুক্ত সিপিএম নেতৃত্বকে এবং তৎকালীন রাজ্য সরকারকে সমস্ত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। নন্দীগ্রামের ভয়ঙ্কর স্মৃতি মানুষের মনে এখনও দগদগে ক্ষতের মতো। তা সত্ত্বেও সিবিআই যে এমন সাজানো রিপোর্ট দিতে সাহস পেল তার পিছনে কংগ্রেসের সাথে সিপিএমের বোঝাপড়া যেমন কাজ করেছে, তেমনি রয়েছে খোদ তৃণমূল সরকারের ভূমিকাও। সরকারে আসার সাথে সাথেই তৃণমূল কংগ্রেস যদি নন্দীগ্রাম আন্দোলনকারীদের ওপর চাপানো মিথ্যা মামলাগুলি প্রত্যাহার করত, দোষী পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের উদ্যোগ নিত, তাহলে সিবিআই এমন মিথ্যায় ভরা রিপোর্ট দিতে সাহস পেত না। ফলে যে সিপিএম নেতৃত্ব নন্দীগ্রাম গণআন্দোলনের উপর নৃশংস অত্যাচার, হত্যা এবং মহিলাদের উপর গণধর্ষণ চালানোর জন্য শুধু এ রাজ্য নয়, সারা দেশেই ধিক্কৃত হয়েছিল, তারা ভরসা পেয়ে এখন বলছে, তাদের সম্পর্কে নাকি মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছিল।

রাজ্যের সাধারণ মানুষের সমস্ত আত্মত্যাগের কৃতিত্বকে আত্মসাৎ করে ক্ষমতায় বসে তৃণমূল সরকার এখন পুঁজিপতি শ্রেণির যথার্থ সেবক হিসাবে নিজের ভূমিকা প্রমাণ করতে আন্দোলন দমনকারী অফিসারদের প্রোমোশন দিচ্ছে, তাদের কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষের ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায়ের আন্দোলনের গলা টিপতে চাইছে। পুঁজিপতি শ্রেণির বিশ্বস্ত সেবক হিসাবে যারাই ক্ষমতায় বসে তাদের আচরণ এরকম। ১৯৭৭ সালে এ রাজ্যে সিপিএম ক্ষমতায় আসার আগে সরকারে ছিল কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সিদ্ধার্থশংকর রায়, গণআন্দোলনের অসংখ্য কর্মীকে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে খুন করার কলঙ্ক যাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সিপিএম নিজেই সেই সময় দাবি করত, তাদের দলের ১১০০ কর্মীকে হত্যা করেছে সিদ্ধার্থশংকর রায়ের পুলিশ এবং ক্ষমতায় এলে অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে তারা। কিন্তু '৭৭ সালে ক্ষমতার মসনদ দখলের পর ঠিক তৃণমূলের মতোই ভোল পাল্টায় সিপিএম। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু পুলিশ কর্তৃক ভূষিত হন 'বঙ্গবীর' উপাধিতে। আর, যেসব পুলিশ অফিসার থানার ভিতরে ও বাইরে নৃশংস অত্যাচারী হিসাবে খ্যাত ছিলেন, সিপিএম তাদের প্রায় প্রত্যেককেই উচ্চ পদে প্রোমোশন দিয়েছিল। তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় বসে হুবহু তাদের দেখানো পথেই চলছে— এ গর্ব সিপিএম নেতারা করতেই পারেন। কিন্তু নন্দীগ্রামের মানুষ, যাঁরা পুলিশ ও সিপিএমের ভাড়াটে ক্রিমিনাল বাহিনীর উন্মত্ত তাণ্ডবের বিরুদ্ধে প্রাণের পরোয়া না করে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, এই তেজস্বিতার মূল্য চোকাতে ক্রিমিনালদের পাশবিক লালসার শিকার পর্যন্ত হতে হয়েছে যাঁদের, যাঁরা চোখের সামনে অসহায় ভাবে খুন হয়ে যেতে দেখেছেন স্বামী, ভাই, সন্তানদের, প্রতিবেশী পরিজনদের, তা সত্ত্বেও মাথা নোয়াননি, লড়াই করে রুখে দিয়েছেন বহুজাতিক সালিম গোষ্ঠীর হাতে হাজার হাজার একর কৃষিজমি তুলে দেওয়ার সরকারি ষড়যন্ত্রকে, তাঁরা কি মানতে পারেন তৃণমূল নেতৃত্বের এই ভূমিকাকে! জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকা সিপিএমের অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রথমে সিঙ্গুর, তারপর নন্দীগ্রামের এই লড়াই-ই তো রাজ্যের মানুষের ভয় ভেঙে দিয়েছিল। সিপিএমের কালাপাহাড়ি আচরণের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস জুগিয়েছিল। শুধু গোটা রাজ্যের নয়, গোটা দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এগিয়ে এসেছিলেন এই আন্দোলনের সমর্থনে। বিক্ষোভ সভা, প্রতিবাদ মিছিল, পথ অবরোধ, বনধ, ধর্মঘটে উত্তাল হয়েছিল রাজ্য। এগিয়ে এসেছিলেন শিল্পী, সাহিত্যিকেরা। তৈরি হয়েছিল 'শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চ'। তারপরের ঘটনা তো ইতিহাস। ৩৪ বছর ধরে সিপিএমের অপশাসনের বিরুদ্ধে জমে থাকা ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটেছিল। নির্বাচনে সরকারি ক্ষমতা থেকে সিপিএমকে হঠিয়ে দিয়েছিল রাজ্যের মানুষ। সেই সাধারণ মানুষ তৃণমূল নেতৃত্বের এই ভূমিকাকে নন্দীগ্রামের মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলেই মনে করছেন।

জীবনাবসান

পুরুলিয়া জেলার আড়ষা লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড ঝড়ু বাগতি ৩০ নভেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। বার্ধক্যজনিত নানা রোগে তিনি কিছুদিন যাবৎ ভুগছিলেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ শোনামাত্র এলাকার সমস্ত কর্মী ও অন্যান্য নেতা কর্মীরাও উপস্থিত হন।

কমরেড ঝড়ু বাগতি ছিলেন এক বিরল চরিত্রের কমরেড। ১৯৬৫ সালে তিনি পুরুলিয়া জেলার নেতা প্রয়াত কমরেড সাধু ব্যানার্জীর মাধ্যমে দলের বৈপ্লবিক চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং এই চিন্তাই যে মুক্তির পথ তা উপলব্ধি করেন। প্রবল দারিদ্র উপেক্ষা করে তিনি সবসময় দলের কাজ করে গেছেন। প্রতিটি গণআন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতেন। জরুরি অবস্থায় তাঁর উপর কংগ্রেসীদের অমানুষিক অত্যাচারও তাঁকে আদর্শ থেকে টলাতে পারেনি। তিনি সর্বদা নেতৃত্বের পরামর্শ অনুযায়ী সংসারও পরিচালনা করতেন। আজও তাঁর বাড়িটি কর্মীদের থাকা-খাওয়ার জন্য অবারিত। এমনকী জেলার বাইরে থেকেও যে কমরেডরা আসতেন তাঁরাও সেই বাড়িতেই থাকতেন এবং পরিবারের সাথে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হত। তাঁর মাসিক পার্টি চাঁদা কখনওই বাকি থাকত না। তিনি নিজে যেতে না পারলেও কর্মীদের ডেকে সেই টাকা দিতেন।১৯৬৭ সালে তিনি যখন রিলিফ কমিটির সদস্য ছিলেন তখন নিজের এক বিঘা জমিটিও দেনার দায়ে বন্ধক রাখতে হয়।

১৯ ডিসেম্বর সিরকাবাদে তাঁর গ্রামে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্মৃতিচারণা করেন দলের পুরুলিয়া জেলা কমিটির সদস্য কমরেড রঙ্গলাল কুমার, প্রাক্তন আড়ষা লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড ভজহরি কুমার ও ফরওয়ার্ড ব্লকের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড ধ্রুবেশ্বর চ্যাটার্জী, সিপিএম লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড দেবেন্দ্রনাথ মাহাত। প্রধান বক্তা দলের জেলা সম্পাদিকা কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য কমরেড ঝড়ু বাগতির বিরল চরিত্রের নানা গুণাবলি নিয়ে আলোচনা করেন।

কমরেড ঝড়ু বাগতি লাল সেলাম

জীবনাবসান

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর লোকাল কমিটির পার্টি কর্মী কমরেড কাজল ঘোষ ২৯ নভেম্বর আকস্মিক দুর্ঘটনায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫১ বছর। সরল ও অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত কমরেড কাজল ঘোষ ছিলেন বিরল মাতৃত্ববোধের অধিকারিনী। দলের কর্মীদের তিনি ছিলেন কাজল বৌদি। ২০ ডিসেম্বর তাঁর স্মরণসভায় কর্মী, সমর্থক ও তাঁর প্রতিবেশীরা তাঁর সহৃদয়তার স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে আবেগরুদ্ধ হয়ে পড়েন।

কমরেড কাজল ঘোষ লাল সেলাম

জীবনাবসান

কোচবিহার জেলার কামিনীঘাট গ্রামের পার্টি কর্মী কমরেড লক্ষ্মী চক্রবর্তী দীর্ঘদিন কিডনির অসুখে আক্রান্ত হয়ে ২১ ডিসেম্বর নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। ১৯৭৮ সালে কমরেড চক্রবর্তী পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবসে কলকাতায় কেন্দ্রীয় সমাবেশে এস ইউ সি আই (সি)-র তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর বক্তব্য শুনে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই বিশ্বাসে অটল ছিলেন।

তিনি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের একজন কর্মী হিসাবে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে গেছেন। পরিবহন সংস্থায় স্টোরের পারচেজ সেকশনে কর্মরত থাকার সময় দুর্নীতির প্রশ্নে কর্তৃপক্ষের প্রভাবশালী কয়েকজনের সাথে তাঁর বারবার সংঘাত হয়েছে। শুধু এই কারণেই তাঁকে অন্যত্র বদলি করা হয়। তবুও তিনি দুর্নীতির প্রশ্নে আপস করেননি। কমরেড চক্রবর্তী বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে কর্মী-সমর্থক ও এলাকাবাসীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান দলের কোচবিহার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও শহর লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড নেপাল মিত্র, এ আই ডি এস ও-র জেলা সম্পাদক কমরেড স্বপন বর্মন সহ উপস্থিত পার্টিকর্মী ও সমর্থকরা।

কমরেড লক্ষ্মী চক্রবর্তী লাল সেলাম

প্রাচীন ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ঃ দাবি ও বাস্তব

ভারতের অতীত গৌরবের রোমান্টিক চিত্রকল্পনা এ দেশের অনেকেরই চিন্তা ও বক্তব্যের প্রিয় বিষয়বস্তু। পাশুপত অস্ত্র বা শক্তিশেলকে অতীতে অ্যাটম বোমা আবিষ্কারের অকাট্য প্রমাণ বলে দাবি করা হত বেশ কিছুদিন আগে। কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন দাবি করেন গণেশের হাতির মাথা বৈদিক যুগে প্লাস্টিক সার্জারির প্রমাণ বা ইত্যাদি ইত্যাদি তখন হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ সরকার স্বীকৃত ধারণায় পরিণত হয়ে যায়। এর থেকে দু'টো বিপদ দেখা দিতে পারে। একদল হিন্দুত্ববাদী আরও জোরের সঙ্গে দাবি করতে থাকবেন পুরাণ-উপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারতের গল্পগাথায় কবিকল্পনা সবই আক্ষরিক সত্য। উল্টোদিকে আর একদল তার প্রতিবাদে বলবেন, অতীত ভারতে বিজ্ঞানের উন্নতি প্রায় কিছুই হয়নি, বিজ্ঞানের জন্ম ও বৃদ্ধি ইউরোপে। দু'টোই ভুল চিন্তা। দু'টি চিন্তাই দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। এর পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান নিবন্ধটি প্রকাশিত হচ্ছে। এটি তৃতীয় তথা শেষ কিস্তি।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ

বৈদিক যুগে শিক্ষাদানের পদ্ধতি ছিল ব্যক্তিগত। এক একজন ঋষি বা জ্ঞানী ব্যক্তি স্বগৃহে গুটিকয় ছাত্রকে শিক্ষা দিতেন। কিন্তু বৌদ্ধযুগে মঠ এবং স্তূপগুলি জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠতে থাকে, যেখানে বহুসংখ্যক শ্রমণ ও ভিক্ষু একত্রে বাস করতেন এবং জ্ঞানের আদানপ্রদান করতেন। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে, যেখানে বহুসংখ্যক শিক্ষক এবং ছাত্র একত্র বসবাস করতেন এবং শিক্ষকরা শিক্ষাদান করতেন। এর মধ্যে গান্ধার (বর্তমানে কান্দাহার ও পূর্ব আফগানিস্তান) দেশের রাজধানী তক্ষশীলা প্রাচীনতম, যা গড়ে উঠেছিল বুদ্ধের সময়কালের কিছু আগে থেকে কিন্তু খ্যাতিলাভ করে বৌদ্ধ যুগে। পরবর্তীকালে মগধ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বিহারের নালন্দায় একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। এছাড়া বলভি, বিক্রমশিলা, জগদ্দল এবং ওদন্তপুরীতেও অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু অনুরূপ শিক্ষাকেন্দ্রের কথা জানা যায়। সে যুগে এইসব শিক্ষাকেন্দ্রের সুনাম বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল এবং দেশ-বিদেশ থেকে ছাত্ররা শিক্ষা নিতে আসতেন।

বর্তমানে হিন্দুত্ববাদীরা এইগুলিকে 'বিশ্ববিদ্যালয়' নাম দিয়ে প্রচার করছেন যে, 'বিশ্ববিদ্যালয়' ধারণার জন্ম প্রাচীন ভারতে। তাই এই বিষয়টা একটু গভীরে বোঝা দরকার। তক্ষশীলা-নালন্দার মতো শিক্ষাকেন্দ্রে বৌদ্ধবিহারের মতো সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মারফত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল ঠিকই, কিন্তু শিক্ষাদান প্রণালীটা ছিল ব্যক্তিগত। নিজগৃহে গুরু-শিষ্য শিক্ষাদানের বদলে শিক্ষাকেন্দ্রে বহু ছাত্র থাকার ব্যবস্থা থাকায় অনেক বেশি সংখ্যক ছাত্রকে শিক্ষাদান এবং নানাজনের মধ্যে জ্ঞানের আদানপ্রদান সম্ভব হয়েছিল। শিক্ষকরা নিজ নিজ যোগ্যতা ও খ্যাতি অনুযায়ী ২০ থেকে ৩০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করতেন, কিন্তু শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং শিক্ষাদান প্রণালী ছিল ব্যক্তিগত।

এর সঙ্গে 'বিশ্ববিদ্যালয়' ধারণার একটা মূলগত পার্থক্য আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌথ জ্ঞানের ভিত্তিতে নির্ধারিত নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি বা curriculum থাকে এবং শিক্ষকদের সেই পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পড়াতে হয়। সেই পাঠ্যসূচি ছাত্ররা ঠিকমতো শিখেছে কি না যাচাই করতে পরীক্ষা হয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক এবং standardized। এই শিক্ষাদান প্রণালী ইউরোপীয় রেনেসাঁসেরই ফসল। তাই তক্ষশীলা-নালন্দা সে যুগের অর্থে খুবই প্রশংসনীয় উদ্যোগ যা জ্ঞানজগতকে এগোতে অনেকটাই সাহায্য করেছে। কিন্তু এগুলিকে প্রকৃত অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায় না।

ভারতে বিজ্ঞানচর্চার অধঃপতন

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এত অবদান থাকা সত্ত্বেও এবং জ্ঞানচর্চার একটা সুস্থ ধারা দীর্ঘকাল বহমান থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় নবম-দশম শতাব্দী থেকে ধীরে ধীরে এই ধারা স্তিমিত হয়ে আসে এবং শেষ পর্যন্ত একেবারে নির্বাপিত হয়ে যায়। ভাস্করাচার্যকে বলা যায় নিভে যাবার আগে শেষবারের মতো জ্বলে ওঠা জ্ঞানের প্রদীপ। তাঁর পরে প্রায় আটশো বছর জ্ঞানজগতে কোনও নতুন সংযোজন ভারতে হয়নি। ভাস্করাচার্যের পর প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানী ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র।

এই অধঃপতনের কারণ কী? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর 'হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি' বইতে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর মতে এর কারণ হিসাবে তিনটি বিষয় কাজ করেছে। প্রথম, জাতিভেদ প্রথার কঠিন রূপে আত্মপ্রকাশ। তাঁর মতে, বিজ্ঞানচর্চার পরিবেশ সৃষ্টির অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ হল, যে কাজ করছে এবং যে চিন্তা করছে তাদের মধ্যে চিন্তার আদানপ্রদান। জাতিভেদ প্রথার প্রবর্তনের ফলে যখন পেশাগুলি বংশগত হয়ে গেল এবং সমাজের চিন্তাশীল অংশের আর কাজের সঙ্গে এবং তার মাধ্যমে প্রকৃতিজগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রইল না, তখন আর তাদের মনে প্রকৃতিজগতের নানা ঘটনা কেন এবং কীভাবে ঘটে সে প্রশ্ন উঠত না, তারা আর নানা ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজতো না। 'The intellectual portion of the community being thus withdrawn from active participation in the arts, the how and why of phenomena – the coordination of cause and effect – were lost sight of – the spirit of enquiry gradually died out among a nation naturally prone to speculation and metaphysical subtitles, and India for once bade adieu to experimental and inductive science. Her soil was rendered morally unfit for the birth of a Boyle, a Descartes or a Newton and her name was all but expunged from the map of the scientific world.'

তাঁর মতে দ্বিতীয় কারণ, মনু এবং শেষদিকের পুরাণগুলিতে কী করা চলবে, কী করা চলবে না —এ সব কঠিনভাবে বেঁধে দেওয়া। "সুশ্রুতের মতে চিকিৎসাশাস্ত্রের শিক্ষার্থীকে মৃতদেহ কাটাছেঁড়া করে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিতরের কথা জানতেই হবে। তাই তিনি পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের উপর জোর দিয়েছিলেন। অথচ মনুর বিধান অনুযায়ী মৃতদেহ স্পর্শ করলেই সেই ব্যক্তি অপবিত্র হয়ে যাবে। তাই ভাগবতের সময়ের পর থেকে শব ব্যবচ্ছেদ করে শিক্ষাদান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ফলত শল্যচিকিৎসার যে ব্যাপক উন্নতি সুশ্রুত-চরকের হাতে হয়েছিল তাও ব্যবহারের অভাবে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছিল।"

তৃতীয় কারণ, চিন্তাশীল মানুষদের উপর বেদান্ত দর্শন এবং বিশেষ করে শঙ্করাচার্যের প্রভাব। অষ্টম শতকের দার্শনিক শঙ্করাচার্য আবার বেদান্ত দর্শনকে পুনরুজ্জীবিত করেন, যে দর্শন অনুযায়ী চারপাশের বস্তুজগৎ হচ্ছে মায়া বা ভ্রমমাত্র। যেহেতু বস্তু জগতের নানা ঘটনার সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং তার উত্তর খুঁজতে গিয়েই বিজ্ঞান অগ্রসর হয়, তাই বস্তুজগৎকে ভ্রমজ্ঞান করলে কারওর পক্ষে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক পাও এগোনো সম্ভব নয়। শঙ্কর বিশেষ করে কণাদ এবং অন্যান্য বস্তুবাদী দার্শনিকদের আক্রমণ করেন এবং ভারতের চিন্তাজগতে তাঁর বর্ধমান প্রভাবে নবম-দশম শতাব্দী থেকে লোকায়ত-চার্বাক প্রভৃতি বস্তুবাদী দর্শনগুলি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ব্যাপারটা এতদূর এগিয়েছিল যে সে যুগের বস্তুবাদী দার্শনিকদের লেখাপত্রও আজ পাওয়া যায় না। তাঁরা ঠিক কী বলতেন তা বুঝতে হয় শঙ্করের লেখা থেকেই, শঙ্কর কোনও বক্তব্যকে আক্রমণ করছেন তা থেকে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মতে ভারতে বিজ্ঞানচর্চার অধঃপতনের একটা বড় কারণ এই ভাববাদী দর্শনের প্রভাব।

উপসংহার

তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চার কিছুটা বৈদিক যুগে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তার সিংহভাগটাই হয়েছিল বৈদিক যুগের পরে, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। পৃথিবীর জ্ঞানজগতে এই সময়ে ভারতের অবদান প্রকৃতই গর্বিত হওয়ার মতো। কিন্তু তা 'বৈদিক' নয়। বরং লোকায়ত-চার্বাক এবং বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাবেই এই অগ্রগতি হয়েছিল। আর নবম-দশম শতাব্দী থেকে বিজ্ঞানচর্চার অধঃপতনের কারণ বেদান্ত এবং বেদ-অনুসারী নানা সামাজিক বিধি নিষেধের প্রভাব। অতীত ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে আমাদের চিনতে হবে এই নিরিখে।

ইউরোপে যেমন আধুনিক ইংরেজি, জার্মান প্রভৃতি ভাষার উদ্ভবের আগে পর্যন্ত, এমনকী সপ্তদশ শতকেও ল্যাটিন ছিল জ্ঞানজগতের সাধারণ ভাষা, তেমনই ভারতে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সংস্কৃতই ছিল জ্ঞান জগতের সাধারণ ভাষা। এইটা জানা না থাকায় অনেকে সংস্কৃতে লেখা যে কোনও কিছুকেই মনে করেন 'বৈদিক'। আর এই সুযোগে হিন্দুত্ববাদীরা 'বৈদিক গণিত', 'বৈদিক জ্যোতিষ' ইত্যাদি নাম দিয়ে মানুষকে প্রতারিত করছেন। বুঝতে হবে বৈদিক গণিত বলে যা চালানো হচ্ছে তার অনেকটার জন্ম ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধর বা ভাস্করাচার্যের হাতে বৈদিক যুগের অনেক পরে। আর বাকিটা আধুনিক লেখকদের স্বকপোলকল্পিত, বৈদিক বলে চালানো হচ্ছে। বৈদিক যুগে জ্যোতিষ বলেও কিছু ছিল না, এর শুরু পরবর্তীকালে কোনও কোনও সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ থেকে।

হিন্দুত্ববাদীরা আরও দাবি করছেন যে, বৈদিক সভ্যতা অতি প্রাচীন— ব্যাবিলন, মিশর, বা সিন্ধুসভ্যতার চেয়েও প্রাচীন। এটা দাবি করতে গেলে প্রমাণ করতে হয় সিন্ধু সভ্যতাও বৈদিক সভ্যতার অঙ্গ, বৈদিক আর্যরা ভারতেরই আদি বাসিন্দা ইত্যাদি। এই কথাগুলোই তারা বলছেন। প্রামাণ্য সূত্রের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এ সব প্রশ্নের

আটের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির পূর্বতন সদস্য মজিলপুর লোকাল কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড শ্রীকুমার চ্যাটার্জী ২৬ ডিসেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘ কয়েক বছর তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছিল না। দু'মাস আগে তাঁর ফুসফুসে ক্যান্সার ধরা পড়ে। চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন তিনি প্রয়াত হন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তাঁর মৃত্যু সংবাদে জেলা অফিসে রক্তপতাকা অর্ধনমিত করা হয়।

গত শতকের '৬০-এর দশকে তিনি সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে এসে কর্মী হিসাবে দলের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন সম্পন্ন পরিবারের সন্তান। যে পরিবারের মধ্যে গরিব চাষি ও মজুরের সংগ্রামী দল এস ইউ সি আই (সি) সম্পর্কে বিরূপতা ছিল। তেমন পরিবারের সন্তান হলেও উন্নত আদর্শ ও মূল্যবোধের আকর্ষণে তিনি দলে যুক্ত হন। যতদিন শারীরিক সক্ষমতা ছিল, তিনি নানা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপে উদ্যোগী ছিলেন। গড়ে তুলেছিলেন ক্লাব সংগঠন। শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন ভূমিকা ছিল। মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলনেরও ছিলেন বিশিষ্ট নেতা। মধ্যশিক্ষা পর্যদের নির্বাচিত সদস্য হিসাবে যোগ্যতার সাথে শিক্ষক স্বার্থে কাজ করেছেন। ১৯৭০ সালে কংগ্রেসি দুষ্কৃতীদের আক্রমণে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে আহত হলেও তাঁকে দলের কাজ থেকে বিরত করা যায়নি। তিনি এলাকার অনেক স্কুলেরই ম্যানেজিং কমিটির কখনও সম্পাদক, কখনও সভাপতি ছিলেন। শরীর ভেঙে পড়ার পর পূর্বের মতো সক্রিয় ভূমিকা নিতে না পারলেও পার্টির প্রতিটি কাজকর্মের খোঁজ রাখতেন। খবর পেলেই অসুস্থ শরীরে উপস্থিত হতেন, সাধ্যমতো ভূমিকা নিতেন। দলের আদর্শের মূল সুর তাঁর জীবনযাত্রায় প্রতিফলিত হত। ঘনিষ্ঠজন হলেও দলবিরোধী বা নিম্নরুচির কথা শুনলে বলিষ্ঠভাবে প্রতিবাদ করতেন। বয়সে ছোটদের নেতা হিসাবে মেনে কাজ করায় তাঁর কোনও দ্বিধা-জড়তা ছিল না। সহজসরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার ফলে তিনি ছিলেন জনপ্রিয়। তাঁর চরিত্র-মাধুর্যে বহু মানুষ ও শিক্ষক আকৃষ্ট হয়ে সংগঠনে যুক্ত হন।

মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই কর্মী, সমর্থক ও গুণমুগ্ধরা তাঁর বাড়ি যান। এমনকী কলকাতার হাসপাতালে শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ অনেকেই উপস্থিত হন। বাড়ি থেকে মৌন মিছিল সহকারে উল্লিখিত স্কুলগুলি ঘুরে দলের জেলা অফিসে তাঁর মরদেহ আনা হয়। সেখানে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার সহ উপস্থিত রাজ্য এবং জেলা নেতৃবৃন্দ মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। গণসংগঠন এবং নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকেও মাল্যদান করা হয়। তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হবে ১২ জানুয়ারি।

কমরেড শ্রীকুমার চ্যাটার্জী লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18

রেল পরিষেবা সম্প্রসারণের দাবিতে আসামে রেল সদর দপ্তরে বিক্ষোভ

রেল পরিষেবা সম্প্রসারণের দাবিতে আসামে আন্দোলন গড়ে তুলছে এস ইউ সি আই (সি)। ২৯ ডিসেম্বর দলের পক্ষ থেকে মালিগাঁওয়ে উত্তর সীমান্ত রেলওয়ের সদর দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। রেলে যাত্রীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি, গুয়াহাটি-মুরকংচেলেক লাইনে দিনের বেলায় ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি, ডেকারগাঁও-রঙ্গিয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেন গুয়াহাটি পর্যন্ত সম্প্রসারণ, গুয়াহাটি-শিলচর লাইনে নতুন ট্রেন চালু প্রভৃতি দাবিতে এই বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সুরতজামান মণ্ডল।

চা-শ্রমিকদের অনাহারে মৃত্যু ঠেকাতে ব্যবস্থার দাবিতে আলিপুরদুয়ারে বিক্ষোভ

৩১ ডিসেম্বর জেলাশাসকের কাছে চা শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবিতে স্মারকলিপি দিল এস ইউ সি আই (সি) আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটি। এদিন আলিপুরদুয়ার চৌপথীতে এক বিক্ষোভ সভায় বিভিন্ন বক্তা চা শ্রমিকদের উপর মালিকী শোষণের নির্মম চিত্র তুলে ধরেন। এরপর বিভিন্ন দাবি সংবলিত পোস্টার-ব্যানারে সুসজ্জিত মিছিল জেলাশাসকের দপ্তরের দিকে রওনা হয়। নর্থ বেঙ্গল টি প্ল্যানটেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড অভিজিৎ রায়ের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল জেলাশাসককে স্মারকলিপি দিয়ে দাবি জানায়, অবিলম্বে বন্ধ ও অচল চা-বাগানগুলিতে পর্যাপ্ত ত্রাণের ব্যবস্থা করতে হবে, মৃতদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, এই সমস্ত চা বাগানে অবিলম্বে ফাউলই প্রকল্প চালু করে আর্থিক অনুদান দিতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারকে বন্ধ ও অচল বাগানগুলি অধিগ্রহণ করে চালু করতে হবে, রাজ্য সরকারকে এর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, এ ব্যাপারে পঞ্চদশ ভারতীয় শ্রম সম্মেলনের সুপারিশ ও সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে — প্ল্যানটেশন লেবার অ্যাক্ট ও অন্যান্য শ্রম আইন মেনে চলতে মালিকদের বাধ্য করতে হবে, পি-এফ, গ্র্যাচুইটির টাকা আত্মসাৎকারী তথা শ্রম আইন ভঙ্গকারী মালিকদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে, টি অ্যাক্ট অনুযায়ী চা শিল্পের উপর নজরদারি ও চা শ্রমিকদের কল্যাণে টি বোর্ডকে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে হবে।

আগামী সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হবে
কমরেড স্ট্যালিনের
'দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'

প্রকাশিত হয়েছে
মার্কসবাদী দৃষ্টিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও পরবর্তী বামপন্থী আন্দোলনের সমস্যা
প্রভাস ঘোষ
দাম ঃ ১০ টাকা

প্রাচীন ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি

সাতের পাতার পর

উত্তর খুঁজলে এঁদের বক্তব্য ধোপে টেঁকে না।

বৈদিক ঐতিহ্যের অতীত গৌরবের যেসব বানানো কথা তাঁরা বলছেন— প্লাস্টিক সার্জারি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা বিমানে চড়ে মুনিঋষিদের গ্রহান্তরে যাত্রা— সেগুলো মানুষের মধ্যে শুধু অন্ধ আবেগেরই জন্ম দেবে না, বিশ্বের দরবারে ভারতকে হাস্যাস্পদ করে তুলবে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতের প্রকৃত অবদানগুলিকেই ভুলিয়ে দেবে। তাই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই হবে। দেশের স্বার্থে, সত্যের স্বার্থে।

তথ্যসূত্র ঃ

১) বিজ্ঞানের ইতিহাস— সমরেন্দ্রনাথ সেন, শৈব্যা প্রকাশন, ১৯৫৫, ২) বৈদিক সভ্যতা— ইরফান হাবিব ও বিজয়কুমার ঠাকুর, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০০৫, ৩) Science in History - J D Bernal, MIT Press 1971, ৪) History of Hindu Chemistry - Acharya P. C. Ray, ৫. ইন্টারনেটে প্রাপ্ত তথ্য

অনাহারী-অর্ধাহারী চা-শ্রমিকদের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী পাঠাতে এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে কোচবিহার শহরে ত্রাণ সংগ্রহ করছেন দলের কর্মী-সমর্থকরা। অন্যান্য এলাকাতেও ত্রাণ সংগ্রহ চলছে।

তামিলনাড়ুতে বন্যাদুর্গত এলাকায় চিকিৎসা শিবির চলছে

বন্যা বিধ্বস্ত তামিলনাড়ুতে দুর্গত মানুষের মধ্যে এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে মেডিকেল ক্যাম্প এখনও চলছে। ১৭ ডিসেম্বর ব্যাসরপাদির মুল্লাইনগরে ক্যাম্প পরিচালনা করেন কর্ণাটকের বেলারি ও দেবনাগরি থেকে আসা চিকিৎসকবৃন্দ। বেলারি থেকে এসেছিলেন ডাঃ পি দিব্য, ডাঃ রাকেশ সহ সাতজন মেডিকেল ছাত্র। দেবনাগরি থেকে এসেছিলেন ডাঃ বাসুধেন্দ্র, ডাঃ শিবকুমার সহ দুজন পুরুষ নার্স।

কেরালা থেকে আগত চিকিৎসক দল শিবির পরিচালনা করেন কল্যাণপুরমে। ছিলেন ডাঃ নাজনিন, ডাঃ সারিন কুমার সহ দুজন মেডিকেল ছাত্র। তামিলনাড়ুর বিল্লুপুরম জেলার নয় জন নার্সিং ছাত্র এই শিবিরগুলিতে সাহায্য করে চলেছেন। ক্যাম্পগুলিতে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করছেন এস ইউ সি আই (সি) এবং গণসংগঠনগুলির স্বেচ্ছাসেবকরা।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucicommunist.org